বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল – আওয়ামী লীগ ও বি,এন,পি'র উদীয়মান নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক পটভূমি ঃ একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

দিলরুবা ইয়াসমিন

GIFT

449250

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
449250

তত্ত্বাবধায়ক
মোঃ ফেরদৌস হোসেন
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

449250

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল – আওয়ামী লীগ ও বি,এন,পি'র উদীয়মান নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক পটভূমি ঃ একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

449250

গবেষক
দিলরুবা ইয়াসমিন
রেজিঃ নং- ৪৭১ (পুনঃ)
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০৩-২০০৪
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
মোঃ ফেরদৌস হোসেন
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য দিলরুবা ইয়াসমিন কর্তৃক উপস্থাপিত "বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল – আওয়ামী লীগ ও বি,এন,পি'র উদীয়মান নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক পটভূমি ঃ একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত অভিসন্দর্ভটি একটি মৌলিক গবেষণামূলক রচনা। আমার জানা মতে, এই অভিসন্দর্ভটি গবেষক ইতোপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী অর্জন বা প্রকাশনার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে উপস্থাপন করেননি।

449250

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

২০.০৫.২০১০

মোঃ ফেরদৌস হোসেন
অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সাম্প্রতিক সময়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'তে উদীয়মান নেতৃত্বের রাজনৈতিক ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি – উভয় দলে উদীয়মান নেতাদের সংখ্যা ও প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু উভয় দলের উদীয়মান নেতাদের উপর কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়নি। তাই আমি আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতৃত্বের উপর গবেষণাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছি। উক্ত গবেষণা সম্পাদনের জন্য আমি অনেকের কাছ থেকে পরামর্শ, সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি। সর্ব প্রথমে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক মোঃ ফেরদৌস হোসেনের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কারণ তিনি তাঁর শত ব্যস্ততার মধ্যেও গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে আমাকে নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতার কারণে কোন গবেষণা সহকারী ছাড়াই আমার পক্ষে একক্ভাবে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। 'সুজন' সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের কাছেও আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কারণ তাদের প্রদত্ত তথ্য আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনকে সহজ করেছে। এছাড়া আমাকে গবেষণা কাজে বিভিন্নভাবে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন ও সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম। আমি তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী সীমিকে। সে গবেষণা কার্যের সমাপ্তি পর্যন্ত আমার পাশে থেকেছে। আমার স্বামী মোঃ আব্দুর রহমান ও দুই কন্যা রায়তা ও রাবসা আমাকে গবেষণা কাজ সম্পাদনের জন্যে সময় ও সুযোগ করে দিয়েছে। তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

দিলরুবা ইয়াসমিন

Dhaka University Institutional Repository

সারণীর তালিকা

সারণী			শিরোনাম
সারণী	১.১	ঃ	৫ম সংসদ থেকে ৯ম সংসদ পর্যন্ত সরকার ও বিরোধী দলের অবস্থান
সারণী	৩.১	ঃ	১৯৬৯-১৯৭০-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতাদের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য
সারণী	৩.২	ঃ	১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চের নির্বাচনের ফলাফল
সারণী	৩.৩	ঃ	১৯৭৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য দলগুলোর নির্বাচনী ফলাফল
সারণী	৪.১	ঃ	৫ম সংসদ থেকে ৯ম সংসদ পর্যন্ত সংসদ সদস্যদের পেশাগত অবস্থান
সারণী	৫.১	ঃ	উদীয়মান নেতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার শতকরা হার
সারণী	৫.২	ঃ	উদীয়মান নেতাদের পেশার শতকরা হার
সারণী	৫.৩	ঃ	উদীয়মান নেতাদের বাৎসরিক আয়ের পরিমান ও শতকরা হার
সারণী	৫.৪	ঃ	উদীয়মান নেতাদের স্থায়ী বাসস্থানের শতকরা হার
সারণী	৫.৫	ঃ	উদীয়মান নেতাদের বয়সের শতকরা হার

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়নপত্র	i
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	ii
সারণীর তালিকা	iii
প্রথম অধ্যায় ঃ সূচনা	১-১০
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা	
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য	
১.৪ গবেষণা পদ্ধতি	
১.৫ গবেষণার পরিধি ও অধ্যায় বিন্যাস	
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ নেতৃত্বের তত্ত্বীয় আলোচনা	১১-৩১
২.১ নেতৃত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ	
২.১.১ সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব	
২.১.২ নৃ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব	
২.১.৩ মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব	
২.১.৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব	
২.২ নেতৃত্বের সংজ্ঞা	
২.৩ নেতৃত্বেব মাত্রা	
২.৪ নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী	
২.৫ নেতার কাজ	
২.৬ নেতৃত্বের উদ্ভব ও বিকাশ ধারা	
তৃতীয় অধ্যায় ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ	৩২-৪৭
৩.১ ব্রিটিশ আমল (১৮৮৫-১৯৪৭)	
৩.২ পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১)	
৩.৩ বাংলাদেশ আমল (১৯৭১-১৯৯০)	

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

চতুর্থ অধ্যায় ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে উদীয়মান নেতৃত্বের বিকাশ ৪৮-৬০

৪.১ সাম্প্রতিক সময়ে ('৯০ পরবর্তী) উদীয়মান নেতৃত্বের ইতিহাস

৪.২ ফলাফল বিশ্লেষণ

পঞ্চম অধ্যায় ঃ সাম্প্রতিককালে (বিগত শতকের '৯০ দশকের পরবর্তী সময়কাল) আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক পটভূমি ঃ তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা – বিশ্লেষণ ৬১-১১০

৫.১ উদীয়মান নেতাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

৫.২ শিক্ষাগত যোগ্যতা

৫.২.১ আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের শিক্ষাগত অবস্থান

৫.২.২ বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের শিক্ষাগত অবস্থান

৫.২.৩ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতৃত্বের শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ

৫.৩ পেশা

৫.৩.১ আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের পেশা সংক্রান্ত জরিপ বিশ্লেষণ

৫.৩.২ বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের পেশা সংক্রান্ত জরিপ বিশ্লেষণ

৫.৩.৩ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের পেশাগত অবস্থানের উপর জরিপ ভিত্তিক বিশ্লেষণ

৫.৩.৪ বাৎসরিক আয়ের পরিমান

৫.৩.৫ আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের বাৎসরিক আয়ের পরিমান বিশ্লেষণ

৫.৩.৬ বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের বাৎসরিক আয়ের পরিমান বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

৫.৩.৭ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের বাৎসরিক আয়ের পরিমান ঃ তুলনামূলক বিশ্লেষণ

৫.৪ স্থায়ী বাসস্থান

৫.৪.১ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের স্থায়ী বাসস্থান সম্পর্কিত আলোচনা

৫.৪.২ আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের স্থায়ী বাসস্থান সম্পর্কে বিশ্লেষণ

৫.৪.৩ বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের স্থায়ী বাসস্থান সম্পর্কে বিশ্লেষণ

৫.৪.৪ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের স্থায়ী বাসস্থানের উপর তুলনামূলক বিশ্লেষণ

৫.৫ বয়স

৫.৫.১ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের বয়স সম্পর্কে আলোচনা

৫.৫.২ আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের বয়স সংক্রান্ত বিশ্লেষণ

৫.৫.৩ বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের বয়স সংক্রান্ত বিশ্লেষণ

৫.৫.৪ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের বয়স সংক্রান্ত তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ সার সংক্ষেপ ও উপসংহার ১১১-১১৯

সপ্তম অধ্যায় ঃ গ্রন্থপঞ্জী ১২০-১২৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সূচনা ঃ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে বর্তমানে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন একটি স্বাভাবিক ঘটনা। ১৯৯০ সালের জানুয়ারিতে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এ নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর যে গণতান্ত্রিক ধারার প্রবর্তন হয়েছে, সেই ধারাবাহিকতায় যে কয়টি নির্বাচন হয়েছে তার ফলে সরকার ও বিরোধী দলের অবস্থান নিম্নরূপঃ[১]

সারণী ১.১

৫ম সংসদ থেকে ৯ম সংসদ পর্যন্ত সরকার ও বিরোধী দলের অবস্থান

নং	সাল	নির্বাচন	ক্ষমতাসীন দল	বিরোধী দল
১	১৯৯১	৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	বিএনপি	আওয়ামী লীগ
২	১৯৯৬	৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	আওয়ামী লীগ	বিএনপি
৩	২০০১	৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	বিএনপি	আওয়ামী লীগ
৪	২০০৮	৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	আওয়ামী লীগ	বিএনপি

যদিও বিভিন্ন সময় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'কে নির্বাচনী সুবিধার্থে অন্যান্য দলের সাথে জোট, মহাজোট গঠন করতে দেখা যায়; কিন্তু জোট, মহাজোটের সার্বিক নেতৃত্ব এ দুটি দলের হাতেই থেকেছে।

উপরোক্ত তথ্য থেকে বলা যায় যে, '৯০ পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি Tradition-এ পরিণত হয়েছে।

[১] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গণনাকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ, বিএনপি উভয় দলের রাজনৈতিক আবির্ভাবের ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ-ভারত স্বাধীন হয়ে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয় ঃ স্বাধীন ভারত, স্বাধীন পাকিস্তান। পাকিস্তানের দুটি অংশ ছিল– পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান (আজকের বাংলাদেশ)। পাকিস্তান রাষ্ট্র দুটি পৃথক জনপদ, দুটি পৃথক সংস্কৃতি নিয়ে যাত্রা শুরু করে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে থাকায় পূর্ব পাকিস্তানীরা বিভিন্নভাবে বঞ্চিত ও নিপীড়িত হতে থাকে। এই নিপীড়ন ও শোষণ–বঞ্চনার প্রতিবাদ ও ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যেই ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরে আওয়ামী লীগ নাম ধারণ করে। পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বায়ত্বশাসনের দাবী আদায়ের জন্য জোরালো আন্দোলন করে যেতে থাকে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানীদের দাবী না মেনে নেওয়ায় স্বায়ত্বশাসনের দাবী স্বাধীনতার দাবীতে রূপ নেয়, যার ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে পরিণত হয়।[২]

মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দল অংশ নিলেও যুদ্ধের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন করে। ১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (তৎকালীন প্রেসিডেন্ট) স্ব-পরিবারে নিহত হলে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে একদিকে অস্থিতিশীলতা এবং অন্যদিকে নেতৃত্ব শুন্যতার সৃষ্টি হয়।

'৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট পরবর্তী অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। প্রেসিডেন্ট জিয়া ক্ষমতায় এসে রাজনীতির যেমন গুণগত পরিবর্তন আনেন (অর্থাৎ স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রাজনৈতিক ধারা থেকে বের হয়ে আসেন), তেমনি অর্থনীতিতেও নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। ফলে দেশের সামগ্রিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। প্রমান

[২] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়, ৩য় খন্ড, ১৯৮২।

Dhaka University Institutional Repository

হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, মুজিব আমলের শেষের দিকে 'বাকশাল' প্রতিষ্ঠিত হয় যা বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করে। কিন্তু জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালে বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করেন এবং ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি পরিবর্তন এবং সমাজতন্ত্রের পথ থেকে সরে এসে সরাসরি পুঁজিবাদের পথ অনুসরণ করেন। Nationalization বা জাতীয়করণের পরিবর্তে বেসরকারীকরণ পলিসি গ্রহণ করেন। জিয়াউর রহমানের প্রবর্তিত রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রতি অন্যান্য দলগুলোকে আগ্রহী হতে দেখা যায় এবং পরবর্তীতে সকল রাজনৈতিক দল এমনকি আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র এই নীতিগুলোকে নিজস্ব রাজনৈতিক Manifesto হিসাবে গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, বিএনপি প্রবর্তিত বহুদলীয় পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিবর্তনে পরবর্তী কোন সরকারকে উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি। বরং বহুদলীয় পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের বিকাশ জিয়ার আমলে শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত চলছে এবং ক্রমবিস্তার ঘটছে। দিন দিন এই ব্যবস্থার প্রতি বিএনপিসহ সব দলগুলোকে আগ্রহী হতে দেখা যাচ্ছে। কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, সত্তরের দশক থেকে বিশ্বে পুঁজিবাদের যে আবহ শুরু হয়েছিল ক্রমেই তার বিস্তার ঘটেছে। তাই বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ধারায় কোন বিকল্প নেই।

উপরোক্ত ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনে আওয়ামী লীগের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আবার স্বাধীন বাংলাদেশে যুগোপযোগী রাজনীতির প্রবর্তনে বিএনপি'র ভূমিকা অনিস্বীকার্য।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ঃ

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মত প্রকাশ করেছেন যে, একটি দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন সে দেশের দলীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কার্যকরী দলীয় ব্যবস্থা এবং এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ একান্ত অপরিহার্য। বাংলাদেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা চালু করা হয় এবং সে সাথে আশা করা হয়েছিল যে, সাবেক পাকিস্তান আমলের অকার্যকর দলীয় ব্যবস্থার আর পুনরাবৃত্তি ঘটবেনা।[৩] তবে এদেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা চালু করার পর লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব

[৩] সাইদ, আবু আল, মুসলিম শাসনকাল, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বঙ্গবন্ধু, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃষ্ঠা- ১২৬-১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের দলীয় ব্যবস্থায় ভারতীয় মডেল প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী, যেখানে প্রভাব বিস্তারকারী দল হিসাবে অধিষ্ঠিত থাকবে স্বয়ং আওয়ামী লীগ। তবে প্রধান কিছু প্রতিবন্ধকতা এবং সমস্যা এক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। যেমন– ১) সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে সরকারী দলের ছাত্র শাখায় কোন্দল এবং নতুন রাজনৈতিক দল হিসাবে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদের বিপ্লবী তৎপরতা; ২) দলীয় ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের অসামর্থ্য; ৩) জাতীয় পর্যায়ে শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব; ৪) অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল, যেমন– ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্ফর) এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)–এর বিকল্প কর্মসূচীসহ কার্যকরী বিরোধী দল গঠনের ব্যর্থতা; ৫) বামপন্থী ছোট দলসমূহের দেশব্যাপী গোপন তৎপরতা এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা, সংকট এবং আইন শৃংখলার অবনতি হওয়ার প্রেক্ষাপটে সার্বিক পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার পন্থা হিসাবে আওয়ামী লীগ সরকার বহু দলীয় ব্যবস্থার স্থলে এক দলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে।[৪] '৭৫–এর ১৫ই আগষ্ট রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান স্ব-পরিবারে নিহত হলে দেশের রাজনীতি ভিন্নখাতে মোড় নেয়। দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর সিপাহি জনতার অভ্যুত্থানে জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসে রাষ্ট্রপতি হন। তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনঃ প্রবর্তন করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইউ পি পি, লেবার পার্টি, ভাসানী ন্যাপকে সঙ্গে নিয়ে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠন করে ১৯৭৭ সালে নির্বাচন করেন। এবং ১৯৭৮ সালে জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি গঠন করেন যার নেতৃত্বে থাকেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট জিয়া। ক্ষমতায় এসে তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথ খুলে দেন, সমাজতন্ত্রের পথ পরিহার করে সরাসরি পুঁজিবাদের নীতি অনুসরণ করেন। তাঁর আমলেই আন্তর্জাতিক সাহায্য ও ঋণ দেশে আসতে শুরু করে। তিনি বিরাষ্ট্রীয়করণের নীতি গ্রহণ করেন। এর ফলে অর্থনীতিতে গতিশীলতা ফিরে আসে। জিয়া আমলের পর ১৯৭৯ সালে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এসে প্রেসিডেন্ট জিয়ার পথ অনুসরণ করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি গঠন করেন। এবং জিয়া সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন, এবং সে অনুযায়ী দেশ

[৪] আহমেদ, মওদুদ, বাংলাদেশ ঃ শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন কাল, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনা করতে থাকেন।[৫] তবে জেনারেল এরশাদ কখনও জেনারেল জিয়ার মত রাজনৈতিক সফলতা পাননি। কারণ এরশাদকে জনগণ সবসময়ই সন্দেহের চোখে দেখত। এ কারণে তাঁর রাজনৈতিক দল ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। যার ফলশ্রুতি '৯০-এর গণ অভ্যুত্থান।

১৯৯১ সালে সুষ্ঠু নির্বাচনের পর দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা চোখে পড়ে। তবে '৯০ পূর্ববর্তী স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের বছরগুলোতে আওয়ামী লীগ সংগঠনকে আরো সুসংহত করে জনভিত্তি মজবুদ করতে সক্ষম হয়। এবং বিএনপি এলিট ভিত্তিক সংগঠন থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে জনভিত্তি গড়ে তোলে।[৬] '৯১-এর নির্বাচনের পর এটা প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশের জনগণ দুটি শিবিরে বিভক্ত। আর তা হলো আওয়ামী লীগ ও বিএনপি– যা পরবর্তী নির্বাচনগুলোতেও প্রতিফলিত হয়েছে।

যেহেতু বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ('৯০ পরবর্তী সময় থেকে) রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'ই গুরুত্বপূর্ণ দল, সেহেতু উভয় দল সম্পর্কে গবেষণা খুবই যুক্তিযুক্ত।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উপর গবেষণা করতে গিয়ে উভয় দলের নেতৃত্বকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ, নেতাই দলের প্রাণ। উভয় দলের নেতৃত্বের প্রেক্ষাপট বা আর্থ-সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগের উৎপত্তি হয়েছিল উদীয়মান নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে, যারা অধিকাংশই গ্রাম থেকে এসে পেশাজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কলকারখানার শ্রমিক হিসাবে শহরে বসবাস করতেন। সহজ কথায় আওয়ামী লীগের প্রারম্ভিক নেতৃত্ব ছিল শহরভিত্তিক নব্য শিক্ষিত তরুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী নির্ভর।

---

[৫] রশীদ, হারুনুর, বাজনীতি কোষ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৩২৫।

[৬] হাসানুজ্জামান, আল মাসুদ, রোল অব অপোজিশন ইন বাংলাদেশ পলিটিক্স, ঢাকা ঃ ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

অপর দিকে, '৭৫ পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিতিশীল, নেতৃত্বশূন্য অবস্থায় বিএনপি'র জন্ম। বিএনপি সৃষ্টি হয়েছিল নগর কেন্দ্রিক সমাজ থেকে। মূলত বিএনপি গড়ে উঠেছিল শহুরে উচ্চ শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত অর্থাৎ এলিট গোষ্ঠী থেকে।

'৭৫ পরবর্তী রাজনীতিতে আমরা Traditional Leader-দের পাশাপাশি উদীয়মান নেতৃত্বের বিকাশ লক্ষ্য করেছি। কিন্তু '৯০ পরবর্তী রাজনীতিতে দেশে রাজনীতি যেমন দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তেমনই উদীয়মান নেতাদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র প্রতি তাঁদের ঝোঁক বেশি বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

তাই আমরা '৯০ পরবর্তী রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণে আগ্রহী হয়েছি।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় বহু দল, বহু মতের প্রাধান্য অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ যেহেতু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সেহেতু বহু দলের উপস্থিতি স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু '৯০ পরবর্তীতে আমাদের দেশে দুইটি দলের প্রাধান্য (দুটি দলের হাতেই ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত হচ্ছে) পরিলক্ষিত হচ্ছে যা ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত নির্বাচনী ফলাফলে লক্ষ্য করা যায়। দুটি দলের মধ্যে কিছু নীতিগত প্রভেদ রয়েছে, আবার কোথাও কিছু নীতিগত মিলও রয়েছে। কিন্তু উভয় দলেই সাম্প্রতিক সময়ে ('৯০ পরবর্তী রাজনৈতিক কাল) উদীয়মান নেতাদের আগ্রহ, অংশগ্রহণ, প্রভাব ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষণার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের দুটি বৃহৎ জনগুরুত্বপূর্ণ দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি বিচারের মাধ্যমে তাদের রাজনীতিতে আসা, দলীয় নেতৃত্ব প্রাপ্তি, দলের অভ্যন্তরে প্রভাব ও তাদের ভবিষ্যত সম্ভাবনা মূল্যায়ন করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের আগামী দিনের নেতৃত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে, যা রাজনীতি অধ্যয়নে গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণায় যে সব উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলো হলো ঃ

প্রথমত ঃ কোন পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উৎপত্তি হয়েছে তা উল্লেখ করা এবং জন্মকালের নেতৃত্ব কাঠামোর প্রকৃতি বিশ্লেষণ।

দ্বিতীয়ত ঃ উভয় দলের নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে পূর্বের নেতৃত্বের সঙ্গে তাদের অবস্থানগত ভিন্নতা চিহ্নিত করা।

তৃতীয়ত ঃ উভয় দলের উদীয়মান নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক পটভূমি কিভাবে এদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করছে তা বিশ্লেষণ করা।

চতুর্থত ঃ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক পটভূমির সঙ্গে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার সংগতি-অসংগতি ব্যাখ্যা করা।

পঞ্চমত ঃ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক পটভূমির প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক আচরণগত ভিন্নতা চিহ্নিত করা।

ষষ্ঠত ঃ উভয় দলের উদীয়মান নেতৃত্বের সামাজিক পটভূমি রাজনৈতিক পরিবর্তনশীলতায় কতটুকু ভূমিকা রাখছে তা নির্ধারণ করা।

সপ্তমত ঃ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য উভয় দলের নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক পটভূমি কতটুকু দায়ী তা নির্ধারণ করা।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি ঃ

যেকোন গবেষণা একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সম্পাদন করা অপরিহার্য। আর এই নিয়ম বা বিজ্ঞানই হলো পদ্ধতি তত্ত্ব (Methodology)।[৭] Holt Gesturner মনে করেন, যে কোন বিজ্ঞানের পদ্ধতিবিদ্যা তার বিশ্লেষণের নিয়মাবলী, গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার

[৭] Gralink, David B. (ed) Websta's New World Victionars, New Delhi: Oxford and IBH Publishing Company, 1975. পৃষ্ঠা- ৪৭১।

Dhaka University Institutional Repository

মানদন্ড, গবেষণা নকশা, উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল এবং উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের নিয়ম অন্তর্ভূক্ত করে।[৮]

Denzin বলেন, সমাজতাত্ত্বিকগণ তাদের পরিবেশ ও প্রতিবেশে যেভাবে কাজ করেন তার প্রধান পথটি রচনা করে পদ্ধতি তত্ত্ব।[৯] যে কোন গবেষণা কর্মের নির্ভরযোগ্যতা ও গুনাগুণ পদ্ধতি তত্ত্বের উপর সরাসরি নির্ভরশীল। অন্যভাবে বলা যায়, যে গবেষণা পদ্ধতি যত বেশি বৈজ্ঞানিক, সেই গবেষণার ফলাফল তত বেশি নির্ভুল হয়ে থাকে। সমাজ বিজ্ঞানী Rose-এর মতে, যেকোন গবেষণা কাজে বিদ্যমান বাস্তবতার জটিল জাল থেকে আমাদের সত্যকে খুঁজে বের করে নিতে হয়। এজন্য একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর অধীনে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। এছাড়া এই পর্যবেক্ষণ এমন পদ্ধতিতে হবে যাতে প্রাপ্ত তথ্যাবলীকে অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে সম্পর্ক নিরূপন করা সম্ভব হয়।[১০] Black এবং Champion বিভিন্ন তথ্য ও পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে Rose-এর বক্তব্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে একই কথা বলেন।[১১]

রাষ্ট্রবিজ্ঞান পদ্ধতি তত্ত্বের উপর জোরারোপ করে Griffith বলেন, পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা, যুক্তি নির্ভরতা এবং সর্বাঙ্গীনতার উপরই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাফল্য ও ব্যর্থতা চূড়ান্তভাবে নির্ভরশীল।[১২] সমাজবিজ্ঞানসহ অন্যান্য সকল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি সমভাবে প্রযোজ্য।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের গবেষণার পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। '৭৫ পরবর্তীতে উদীয়মান নেতাদের বিকাশ শুরু হলেও '৯০ পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত থেকে

---

[৮] Holt, Robert T. and Turner John E, The Methodology of Comparative Research, New York: Free Press, পৃষ্ঠা- ২।

[৯] Denzin, Normank, The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods, New York: MC Grow – Hill Book Co., 1978, পৃষ্ঠা- ৬।

[১০] Rose Arnold M, Sociology: The Study of Human Relations, New York: Alfred P. Nopt, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা- ২।

[১১] Black James A. and Champion, Deany, Methods and Issues in Social Research, New York, John Hill and Sons Ltd., ১৯৭৫, পৃষ্ঠা- ২।

[১২] Griffith, Ernest S. "The Method and Problems of Research in Ernests, Griffith (ed), The Research Committee in Political Science – The Work of the Panels of the Research Committee American Political Science Association, Chapel Hill, University of North Carolina Press, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা- ২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

যাচ্ছে। এটা দেশের প্রেক্ষাপটে সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দুই দলকে কেন্দ্র করে উদীয়মান নেতাদের আগ্রহও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের কারণ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন গ্রন্থ / প্রবন্ধ হতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে উক্ত বিষয়ে বর্ণনামূলক আলোচনা করেছি। এরপর আওয়ামী লীগ থেকে ১০০ জন এবং বিএনপি থেকে ১০০ জন উদীয়মান নেতাকে দৈবচয়িতভাবে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করেছি। যাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতা, সংসদ সদস্য, মহানগর নেতা, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নেতা রয়েছেন। এসব নেতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, পেশা, বাসস্থান, বাৎসরিক আয়ের পরিমাণের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ চালিয়েছি। পর্যবেক্ষণের প্রাথমিক পর্যায়ে সরাসরি কথপোকথন, ফোনালাপ, EC (Election Commission), সুজন (সুশাসনের জন্য নাগরিক), Internet থেকে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করেছি। মাধ্যমিক উৎস হিসাবে বিষয় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ ও প্রতিবেদন থেকেও তথ্য নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করার পর সংগৃহীত তথ্য সারণী ও লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এরপর সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে উভয় দলের উদীয়মান নেতাদের অবস্থান উপস্থাপন করেছি। এরপর উভয় দলের উদীয়মান নেতাদের আর্থ-সামাজিক ভূমিকার উপর তথ্যভিত্তিক তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে উভয় দলের উদীয়মান নেতাদের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে।

১.৫ গবেষণার পরিধি ও অধ্যায় বিন্যাস ঃ

সামাজিক গবেষণার পরিধি নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ছাড়া গবেষণার পরিধি সামাজিক গবেষণার একটি অন্যতম দিক। কারণ গবেষণা কর্মটি কি একটি বিষয়ে না একাধিক বিষয়ে করা হয়েছে পরিধিতে তা উল্লেখ থাকতে হয়। একইভাবে, গবেষণার অন্তর্ভূক্ত তথ্য উপাত্ত কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তার সীমারেখা নির্ধারণও আবশ্যক। উক্ত গবেষণার সংগৃহীত তথ্য উপাত্তগুলোকে প্রক্রিয়াকরণের পর ফলাফল সারণীবদ্ধ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এবং তথ্য উপাত্তগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যে সব অধ্যায়ে বিন্যাস করে আলোচনা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়	ঃ	ভূমিকা
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	নেতৃত্বের তত্ত্বীয় আলোচনা
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	বাংলাদেশের রাজনীতিতে উদীয়মান নেতৃত্বের বিকাশ
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	সাম্প্রতিক সময়ে (বিগত শতকের ৯০ দশকের পরবর্তী সময়কাল) বাংলাদেশের দুইটি রাজনৈতিক দল – আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক পটভূমি তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	সার সংক্ষেপ ও উপসংহার
সপ্তম অধ্যায়	ঃ	গ্রন্থপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

নেতৃত্বের তত্ত্বীয় আলোচনা

সাধারণত নেতৃত্ব বলতে বোঝায় ব্যক্তির সেই ক্ষমতা যা দ্বারা সে অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে। অর্থাৎ নেতৃত্ব হচ্ছে একজন ব্যক্তি মানুষের বহুবিধ গুনাবলীর মাধ্যমে একটি দলের, গোষ্ঠী কিংবা সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পরিচালনা ক্ষমতা। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ কোন না কোন ধরণের নেতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছে এবং তার নির্দেশ মেনে চলেছে। যে কারণে নৃ-বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানে নেতৃত্বের ধারণাটি বেশ গুরুত্ব লাভ করেছে। যদিও নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিভিন্ন লেখক ও দার্শনিকের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত কোন বিশেষ লক্ষ্যাভিমুখী কর্মকান্ডে জনগণকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার কার্যক্রমই নেতৃত্ব । এরূপ একটা সংগঠিত গোষ্ঠীর লক্ষ্য নির্ধারণ ও লক্ষ্য অর্জন কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়াকে নেতৃত্ব বলে অভিহিত করা যায়।

২.১ নেতৃত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ঃ

নেতৃত্ব সম্পর্কে সঠিক ও বিশদ ধারণা পাওয়ার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক ধারাবাহিক অনুশীলন প্রয়োজন। এ কারণে আমরা সমাজবিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নেতৃত্বের ধারণা বিশ্লেষণে আগ্রহী হয়েছি।

২.১.১ সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব ঃ

নেতৃত্ব কি– এ সর্ম্পকে সমাজ বিজ্ঞানে প্রথমে আসে মানুষের কোন আচরণ নেতৃত্ব গঠনকে প্রভাবিত করে সে বিষয়টি। মানুষ যখন একই ধরণের বিশ্বাস, প্রচলিত রীতিনীতি, আর্থ-সামাজিক গতিবিধি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা লক্ষ্য পুরণে অগ্রবর্তী হয়, তখনই মানুষের মধ্যে সমষ্টিগত বা দলগত থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং এই সমষ্টিগত প্রচেষ্টার মধ্যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থও সমভাবে জড়িত থাকে। যার ফলে ব্যক্তি এই দলগত প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় এবং এই প্রচেষ্টাই ব্যক্তিকে নেতৃত্ব গঠনে উদ্বুদ্ধ করে ।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও দলগত বা সমষ্টিগত আচরণের কোন সুস্পষ্ট নিয়ম নেই যা দ্বারা চিহ্নিত করা যাবে কে দলীয় কর্মী আর কে বহিরাগত। কিন্তু এখানে নেতা শনাক্ত করার সুনির্দিষ্ট উপাদান আছে। নেতাকে হতে হবে এমন, যার আচরণে থাকবে সমষ্টিগত গ্রহণযোগ্যতা, অর্থাৎ দলের সবার কাছে তিনি থাকবেন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি এবং তার প্রতিটি কাজের জন্য জনগণ এবং দলীয় কর্মীদের কাছে নিজস্ব ব্যাখ্যা থাকতে হবে। অর্থাৎ জবাবদিহিমূলক আচরণ নেতৃত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এসব আচরণগত বৈশিষ্ট্যের কোনটির বিচ্যুতি হলে মূহুর্তে জনগণের নেতা পরিণত হতে পারেন জনগণের ঘৃণায়। একজন প্রচলিত ঐতিহ্যগত নেতাও ধুলায় মিশে যেতে পারেন।[১]

অতএব, সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় নেতা বলতে বোঝায় ব্যক্তির সেই বিচক্ষণতা, যা মানুষের সমষ্টিগত বা দলগত মনোভাব, যথা– অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, সামাজিক গতিশীলতা এবং রাজনৈতিক আদর্শ বাস্তবায়নে সঠিক দিক নির্দেশনা দিবে এবং যার থাকবে জবাবদিহিতা। এই সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার থেকে গৃহীত ধারনা অনুসারে নেতৃত্ব হলো ব্যক্তির সেই গুনাবলী যার মাধ্যমে সে অন্যদের প্রভাবিত করে এবং অন্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে।[২] আবার সি আই বানার্ড এর মতানুসারে, নেতা সকলের পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন এবং সকলের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি হয়ে পড়েন অনুসারীদের কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্র।[৩] অর্থাৎ বলা যায় যে, যে কোন কর্ম উদ্যোগ অথবা রাজনৈতিক উন্নয়ন বা কোন গঠনমূলক কাজে যিনি সঠিক দিক নির্দেশনা দেন এবং যিনি তাঁর প্রতিটি কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করে থাকেন তিনিই নেতা।

২.১.২ নৃ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব ঃ

নৃ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আদিম সমাজ থেকেই নেতৃত্বের উদ্ভব। যখন মানুষ গুহাবাসি ছিল, বন্য পশু-পাখি শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ করে প্রকৃতি ও প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকত, তখন থেকেই মানুষ সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন করেছে। এই সংঘবদ্ধ জীবনে যিনি সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী ও

---

[১] Encyclopacdia Britanika-adi-2005, V-16 , Page–556.
[২] ঐ।
[৩] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মক্ষেত্রে বেশী কৌশলী তাকেই নেতা হিসাবে মেনে চলা হতো। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পশু শিকারে পারদর্শিতা দেখাতে পারতেন, শত্রুর মোকাবেলায় পারঙ্গম ছিলেন তিনিই হতেন নেতা। যদিও যুথবদ্ধ জীবন কখনও কখনও ব্যক্তির প্রাধান্য খর্ব করত, তবুও নেতৃত্বকে মেনে নেয়া হতো। মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা দিয়ে শুরু হয়েছিল পরিবার তন্ত্রের। সেখানেও দেখা যায় যে, মা-ই ছিলেন পরিবারের প্রধান। সন্তানরা তার নির্দেশ মেনে চলতো।

গুহাবাসী জীবনের পর আসে প্রস্তর যুগ, তারপর লোহা যুগ। এসব যুগেও মানুষ ছিলেন সংঘবদ্ধ। আর সংঘবদ্ধ মানব সমাজকে পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হতো সংঘ প্রধানের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বিচক্ষণ ও শক্তিশালী। সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক ধারায় দেখা যায়, মানুষ পশুপালন যুগে যাযাবর জীবন-যাপন করত। পশুপালন যুগে মানুষকে পশুর উপযুক্ত খাদ্য ও পানির সংস্থান যেখানে সম্ভব সেসব জায়গা খুঁজে বের করে অবস্থান করতে হতো। আবার খাদ্য ঘাটতি হলেই নতুন খাদ্য উপযোগী জায়গার সন্ধানে বের হতে হতো। এসব কাজে সঠিক দিক-নির্দেশনা যিনি দিতেন তিনিই ছিলেন নেতা বা গোষ্ঠীর প্রধান। বিবর্তনের ধারায় মানুষ কাঠের ব্যবহার শুরু করে, যা তাকে স্থায়ী বসতি স্থাপনে সহায়তা করে। তখন থেকে মানুষ কৃষি উৎপাদনের যন্ত্র আবিষ্কার করে এবং মানুষের যাযাবর জীবনের অবসান হয়। কিন্তু তখনও মানুষ ছিলো গোষ্ঠীবদ্ধ। কৃষিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গোত্রের সৃষ্টি হয়। এসব গোত্রগুলো পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকত। কৃষিতে ফলন বেশী পাওয়ার লোভে একে অন্যের জমি দখলে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেত। এই কর্মকান্ডে গোত্র প্রধান কখনও নির্দেশ প্রদান করতেন, কখনও বা নিজেই সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। এসব যুগে গোত্রের অন্যান্য সদস্যরা গোত্র প্রধানের খুবই অনুগত থাকতেন। তিনিই হতেন গোত্র প্রধান যিনি ছিলেন সব কাজে পারদর্শী। কৃষির আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে সামন্ত যুগের। সামন্ত যুগের সামন্ত প্রভুর কর্তৃত্ব, অপরিমেয় ক্ষমতা প্রমাণ করে তার নেতৃত্বকে।

অতএব দেখা যায় যে, নৃ-বিজ্ঞানের মতে সেই প্রাচীনকাল থেকেই অর্থাৎ যখন থেকে মানুষের জীবন সংগ্রাম শুরু হয়েছে তখন থেকেই মানুষ সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন করছে। আর সংঘবদ্ধ জীবন মানেই ব্যক্তি বিশেষের প্রভাব দ্বারা সংঘবদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

জনগোষ্ঠীর জীবন পরিচালনা। অর্থাৎ নেতৃত্বের প্রভাব, নেতৃত্বের গুরুত্ব, নেতৃত্বের প্রয়োজন আদিম সমাজ থেকেই পরিলক্ষিত হয়।

২.১.৩ মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব ঃ

নেতৃত্বকে বিশ্লেষণের জন্য মনোবিজ্ঞানে দুটি তত্ত্ব প্রচলিত আছে। প্রথমটি হচ্ছে, মহামানব তত্ত্ব (Greatman Theory) আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, পরিস্থিতি তত্ত্ব বা সময় তত্ত্ব (Time Theory)। মহামানব তত্ত্বের মতে, একজন ব্যক্তি মূলত তার নিজ জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। এ ধরণের নেতৃত্ব ব্যক্তির একান্তই নিজস্ব অর্জন। যুগে যুগে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মীয়, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক মতবাদ প্রচার করে যারা স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তাদেরকে মহামানব নেতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এই মতবাদ অনুযায়ী নেতারা জন্মগতভাবে নেতা অর্থাৎ নেতৃত্বের গুনাবলী জন্মগত ও উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত। অন্যদিকে পরিস্থিতি তত্ত্ব অনুযায়ী নেতারা সামাজিক পরিস্থিতি ও সময়ের সৃষ্টি। ইতিহাসই একজন ব্যক্তিকে নেতা হিসাবে নির্বাচিত করে। উল্লেখিত দুটি তত্ত্বের প্রথমটিকে Subjective বা আত্মনিষ্ঠ এবং দ্বিতীয়টিকে Objective বা বস্তুনিষ্ঠ তত্ত্ব হিসাবে বিবেচনা করা যায়। এ দুটি তত্ত্বের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় আত্মনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ উপাদনসমূহের মিথস্ক্রিয়ার ফলেই প্রকৃত নেতার জন্ম। বিশ শতকের জওহরলাল নেহেরু, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, সুভাষ চন্দ্রবসু, মাও জে ডং, হো চি মিন, শেখ মুজিবুর রহমান, আয়াতুল্লাহ খোমেনী, কিংবা নেলসন মেন্ডেলা– এদের সবার যেমন নেতা হবার নিজ নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিলো, তেমনি তৎকালিন বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিও এদের নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হিসাবে অবদান রেখেছিল।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, নেতৃত্ব হচ্ছে নেতা, অনুসারী এবং পরিবেশ সংশ্লিষ্ট উপাদানের একটি মিথস্ক্রিয়া। এটি একটি মডেলের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

L.F.L.F.S.

এখানে, L = Leadership (নেতৃত্ব)

F = Function (ভূমিকা)

L = Leader (নেতা)

F = Follower (অনুসারী)

S = Situational Variables (পরিস্থিতিগত উপাদান)

কাজেই নেতৃত্ব হচ্ছে কোন সামাজিক পরিস্থিতিতে নেতার সাথে তাঁর অনুসারীর এক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। নেতার এমন বৈশিষ্ট্য থাকবে যার মাধ্যমে তিনি অনুসারীর স্বেচ্ছা আনুগত্য ও আস্থা লাভ করে তাদের আচরণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হবেন।

সমাজে নেতৃত্বের বিভিন্নমুখী প্রকৃতি থাকা বিচিত্র কিছু নয়। সব ধরণের নেতার একটি পরিপূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। তবে এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেতৃত্বের উল্লেখ করা যায়। যেমন- বুদ্ধিবৃত্তিক নেতা, প্রাতিষ্ঠানিক নেতা, রাজনৈতিক নেতা, গণতান্ত্রিক নেতা, জনমত সৃষ্টিকারী নেতা, ধর্মীয় নেতা ইত্যাদি । তবে বাস্তবতা হলো এই যে, একই সমাজে একই সময়ে বিভিন্ন ধরনের নেতা থাকতে পারেন, যারা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সমাজ প্রগতিতে অবদান রাখেন।

২.১.৪ রাষ্ট্র বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব ঃ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধিতে নেতৃত্ব অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা কখনও সফল হবে না, যদিনা নেতৃত্বের ধারণা নিশ্চিত করা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিস্তৃতি রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনৈতিক দলকে ঘিরে। আর এসব পরিচালনার দায়িত্ব যার উপর অর্পিত, তিনি নেতা। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নেতৃত্বের আলোচনা অনিস্বীকার্য ও সুবিদিত। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোকে নেতৃত্বের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করব।

Dhaka University Institutional Repository

তাত্ত্বিকভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চিরন্তন মতবাদ–এ বলা যায়, One of the most observed & least understood phenomena on earth[৪] । এটা সত্য যে নিরবময় প্রকৃতিতে নেতৃত্ব অত্যাবশ্যকীয়। এটা অন্যতম মানবিক শর্ত। কারণ, মানুষ তার সমষ্টিগত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায় আর লক্ষ্য পুরণে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখে নেতৃত্ব। এই সম্পর্কে বিস্তর তথ্য পাওয়া যায় পশ্চিমা দার্শনিকদের মতবাদ থেকে। যেমন প্লেটোর দার্শনিক রাজা থেকে হবস্ এর সার্বভৌমত্ব পর্যন্ত সকলেই স্পষ্ট ভাষায় বর্ননা করতে চেষ্টা করেছেন আদর্শ নেতার প্রকৃতি।[৫] প্রাচ্যের চিন্তা জগতে **লিজুটিজু, কনফুসিয়াস, চাঁঙ্গকিয়া,** ইমাম গাজ্জালী এবং আরো অনেকে লিখেছেন রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম সম্পর্কে এবং তা করতে গিয়ে অনুপম দৃষ্টি দিয়েছেন মানব সভ্যতার নেতৃত্বের প্রতিবন্ধকতাগুলো দুর করার দিকে।

২.১.৪(ক) মহামানব তত্ত্ব (Greatman Theory) ঃ

বস্তুত নেতৃত্বের মধ্যে থাকে কিছু জরুরী ও জটিল ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বিষয় যা সম্পর্কিত থাকে নেতা ও তার অনুসারীদের প্রসঙ্গে। এক কথায় এগুলোকে বলে "বিশেষ লক্ষণ"। Greatman –এর এই বিশেষ লক্ষণ তত্ত্ব উনিশ শতক এবং বিশ শতকের প্রথমভাগে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। এই তত্ত্বগুলোকে বলা হয়েছিল নেতৃত্বের গুণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। আরো বলা হয়েছিল, উচ্চ শ্রেণীর মানুষের দ্বারা মহাপুরুষের জন্ম হতো, তাদের তৈরী করা যেত না। বিশ শতকের প্রথমভাগে মহামানব তত্ত্ব বা Greatman Theory প্রকাশিত হয় বিশেষ লক্ষণ তত্ত্বের মধ্যে।[৬] বিশেষ লক্ষণ তত্ত্বে বর্ননা করা হয় সাধারণ জনগণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভিতর থাকে–সামর্থ্য, লক্ষ্য এবং আচরণের ধরণ। বিশেষ লক্ষণ তত্ত্বে চিহ্নিত করা হয় ছয় ধরণের বিশেষ লক্ষণ যা দ্বারা পৃথক করা যায় নেতৃত্বকে সাধারণ জনগণ থেকে। এগুলো হলো পরিচালনা করার ক্ষমতা, নেতৃত্বের ইচ্ছা, ঐক্য বজায় রাখতে পারা, প্রত্যক্ষ করার যোগ্যতা, আত্মবিশ্বাস, জ্ঞান। অন্য আরও কিছু বিশেষ লক্ষণ রয়েছে যেমন– অসামান্য প্রতিভা, সৃষ্টিশীলতা, নমনীয়তা।

---

[৪] Martin M. Cheraens and Roya ayman, Leadership Theory and Research, Academic Press Sandiego, California 1993, Page- 216.

[৫] Ibid, Page- 217

[৬] Rahman Ataur, 'Challenges of Governance in Bangladesh', BIISS Journal, ISEAS and Dhaka, 1997.

Dhaka University Institutional Repository

২.১.৪(খ) মাধুর্যপূর্ণ নেতৃত্ব (Charismatic Leadership) ঃ

বিশ শতকের মাঝামাঝিতে আধুনিক মতবাদের সূচনা হয়। আধুনিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের মতবাদের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন ম্যাক্সওয়েবার, যিনি ধারণা দিতে চেষ্টা করেছিলেন যে, আধুনিক নেতৃত্ব হচ্ছে ঐতিহ্যগত, মাধুর্যপূর্ণ এবং যুক্তি সঙ্গতভাবে বৈধ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিচালিত।[৭]

তার মতবাদ অসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সমাজবিজ্ঞানীরা বিমোহিত এবং তাদের অনেকে মনযোগ সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই মতবাদের সত্যতা আবিষ্কারে আগ্রহী হয়ে উঠেন।

যদিও Charismatic নেতৃত্বের উৎস, স্বভাব নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ভিতর বিতর্ক বিদ্যমান। কিন্তু বিশ শতকের ইতিহাস পাঠে আমরা অনেক মাধুর্যপূর্ণ নেতৃত্ব বা Charismatic Leadership এর সন্ধান পাই। যেমন- হিটলার, গান্ধি, মার্টিন লুথার কিং, ক্যাস্ট্রো, মাওসেতুং, কেনেডি, দ্য গল এদের সবার রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষণে পাওয়া যায় চিরন্তন মাধুর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ওয়েবার বলেছেন, "কারিশমার যোগান আসে ব্যক্তির ভিতর থেকে, যা তাকে অনুসারীদের তার প্রতি আবেগপ্রবণ হতে, তাকে মান্য করতে এবং তার দ্বারা উৎসাহিত হতে সাহায্য করে। একইভাবে মাধুর্যকে অনুসারীরা উপলব্ধি করে অন্তরঙ্গভাবে এবং যা সাড়া জাগায় নেতার পক্ষে।[৮] ওয়েবার আরো বলেন, "কারিশমা নেতার এক গুরুত্বপূর্ণ গুণ, যা অর্জিত হয় তাঁর রাজনৈতিক কর্মকান্ডের পরিমাপ থেকে।" এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন, "যদি নেতা দীর্ঘ সময় ধরে ব্যর্থ হন, মোটের উপর তাঁর নেতৃত্ব থেকে অনুসারীরা কোন সুফল না পায়, তবে ধরে নিতে হবে তাঁর মাধুর্য অদৃশ্য হয়ে গেছে"।[৯]

রাজনৈতিক নেতৃত্ব তত্ত্বে আছে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর, অতীতের বিভিন্ন দশকে যা হয়েছে নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রায়নের মাধ্যমে। লেসওয়েল তাঁর Political man গ্রন্থে বলেছেন যে– "নতুন প্রজন্মের কিছু উচ্চভিলাষী, কঠিন

---

[৭] Jay A.Conger, The Charismatic Leader, Jossey – Boss Publishers , San Francisco, 1989, Page- 131

[৮] Max Weber, Sorce book, Jay A. Conger, The charismatic leader, Jossey-Boss Publishers. San Francisco 1989, Page- 240.

[৯] Max Weber, Sorce Book, Jay A. Conger, The Charismatic Leader, Josey Bos Publishers, San Francisco, 1989.

Dhaka University Institutional Repository

আমলাতান্ত্রিক নেতা আছে, যারা জনগণকে ধাবিত করে গন্তব্যে পৌঁছাতে এবং লক্ষ্য বাস্তবায়নে। নতুন ধরণের এই নেতারা অংশ নেয় জনতার সাথে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, যেমন- ব্যক্তি, সংঘ, সুশীল সমাজ, প্রত্যেকের সাথে।"[১০]

রোনাল্ড হেপেজ (Heifetz) তার Apity নামক বই–এ Leadership without easy answar-এ আলোচনা করেছেন এইভাবে যে, "আজকের নেতা বর্ধিত হয়ে আরো জটিল ও লক্ষ্যহীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন, পূর্বের যে কোন সময় থেকে"।[১১] নেতৃত্ব হচ্ছে এমন এক পদ্ধতি যাকে বলা যায় Adaptive work বা খাপ খাওয়ানোর কাজ। এখানে নেতা তার অনুসারীদের এগিয়ে নিয়ে যায় ধারাবাহিক পরিবর্তনের দিকে। Heifetz বলেন যে, "নেতার কাজ হচ্ছে অনুসারীদের সমর্থন দিয়ে এমন যোগ্য করে তোলা যাতে করে তারা যে কোন ধরণের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে।"[১২]

২.১.৪(গ) গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব (Democratic leadership) ঃ

জেমস ও টুল তাঁর বই Leading change এ বলেছেন যে, "পরিবর্তনশীল পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সংযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এসব অন্তর্ভুক্তি যেখানে সম্ভব সে সব রাজনৈতিক নেতৃত্বকে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলে। যদি কোন রাজনৈতিক দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্বের ভিতর গণতন্ত্রের চর্চা না থাকে, তবে তারা কখনও দেশে গণতন্ত্র দিতে সমর্থ হয় না।" প্রত্যেকের দাবী গুরুত্বের সঙ্গে শুনতে হয় এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ–এর ক্ষেত্রে কিছু প্রত্যাখান করতে হয়। এসব কাজ করতে নেতাকে অবশ্যই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হয়।[১৩]

Barbara Kellerman, যিনি আমেরিকান নেতৃত্ব বিষয়ক পন্ডিত, তিনি বলেছেন, "রাজনৈতিক নেতৃত্বকে হতে হয় যেমন প্রতিযোগিতা প্রিয়, তেমনই দক্ষ কর্মী।

---

[১০] Laswell, Political men, Sorce book, Jay A. Conger, The Charismatic Leader, Jossey-Boss Publishers, San Francisco-1989, Page- 216.
[১১] Heifetz Ronald, Leadership without easy Answar. Harvard University Press, 1996, Page- 114.
[১২] Ibid.
[১৩] James O'Toole, leading change, Sorce book, Huntington Samuel P, The third wave, Democratization in the Late twentieth Century, University of oklahoma, Press, 1991, Page- 49.

Dhaka University Institutional Repository

সে অবশ্যই পরিবর্তন আনতে পারে দেশীয় সংস্কৃতিতে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে।[১৪]

Barbara Kellerman তার গ্রন্থ Reinventing leadership এ বর্ণনা করেছেন, American নেতাদের সমস্যা হচ্ছে তাদেরকে পৃথক পৃথকভাবে মোকাবেলা করতে হয় পুরানো ধাঁচের দীর্ঘসূত্রের আমলাতন্ত্রের সাথে, উদাসীন ভোটারদের সাথে, যাদের মধ্যে গণতন্ত্রের চিন্তা ও চর্চা খুব কম। ভোটাধিকার বঞ্চিত অনুসারী এবং নষ্ট নেতা-কর্মীর সম্পর্ক, যা কেন্দ্রিভূত আছে জনগণের ভিতর এবং কখনও তা জনপ্রিয়তাও পায়। এ ছাড়াও আছে জটিল ইস্যু ও মূল্যবোধ। অবশ্য আমেরিকার এসব সমস্যা উন্নয়নশীল দেশেও বিদ্যমান। এ সম্পর্কে Kellerman -এর দেওয়া সমাধান হচ্ছে– শক্ত বাঁধনে নেতা-অনুসারীদের বাঁধতে হবে, ব্যবসায়ী নেতাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। জনগণকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় দায়িত্ব নিতে হবে এবং যথাযথ কর্ম করতে হবে।[১৫]

২.১.৪(ঘ) সংযোজক নেতৃত্ব (Connective Leadership) ঃ

অনেক কারণে নেতৃত্ব জটিল হয়ে যায়, যা দেশের জন্য সুখকর হয় না। কারণ দক্ষতার সাথে অর্থনৈতিক সুব্যবস্থাপনা, সংঘের মধ্যে সাড়া জাগানো এবং নির্বাচক মন্ডলীর সাথে নেতৃত্বের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়া – বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক নেতাকে এসব দায়িত্ব পালন করতে হয় বিধায় একে সংযোজক নেতৃত্ব বা Connective Leadership বলে।

যেমন– Jean Lippman Bilumen তাঁর রোমাঞ্চকর এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন গ্রন্থ Connective Leadership-এ যে ধারণা দিয়েছেন তা হলো– সমসাময়িক নেতাকে যুক্ত হতে হবে বিভিন্নভাবে অর্থাৎ আজকের নেতা প্রতিনিধিত্ব করবে নতুন শক্তি এবং নতুন ইস্যু নিয়ে। যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবে নির্বাচকমন্ডলী, মানবজাতির উন্নয়ন, নারীর অধিকার, আরো কিছু সমস্যা যেমন– দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, পরিবেশ বিপর্যয় নিয়ে।[১৬]

---

[১৪] Kellermen Barbara, Political Leadership, University of Pittersburg Press 1986, Page- 221.
[১৫] Barbara Kellermen, Reinventing Leadership, Politics and Business, State University Press, 1986, Page- 95.
[১৬] Jean, Lippman Blumen, Connective Leadership, Sorce Book, Robert K. Greenleaf, The Power of Servant Leadership, Burret Coehlee Publishers, 1998, Page- 125.

Dhaka University Institutional Repository

Lippmann Blumen আরো যুক্তি দেখিয়েছেন যে, যুদ্ধবিদ্যায় যান্ত্রিক উন্নয়ন করে জনগণের সাথে পারস্পারিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাদের যে কোন ধরণের সমস্যা প্রতিহত করার যোগ্য করে তোলা নেতার দায়িত্ব। নেতাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে তার ব্যক্তিগত সততা, জনগণের কাছে জবাবদিহিতা এবং রাজনীতিতে সর্ব সাধারণের অংশ গ্রহণের সুযোগ। যেমন-নতুন প্রজন্মের আমলা নেতাদের উচিৎ সংযোজক নেতা বা Connective Leader হিসাবে সমাজকে দীর্ঘ সময় ধরে সেবা দেওয়া এবং নতুন নেতৃত্ব তৈরীতে কাজ করা। শুধু তাই নয়, জনগণ যাতে তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সে বিষয়েও তাদের যত্নশীল হতে হবে।[১৭] এই মতবাদের উপর ভিত্তি করে কেলারমেন Connective Leadership ও Political Leadership-কে একসুত্রে গ্রোথিত করে সুশীল সমাজের ও বাণিজ্যিক বিশ্বের মধ্যে Super Relation তৈরী করেছেন, যাকে তিনি "Total System" হিসাবে শনাক্ত করেছেন"।[১৮]

সংযোজক নেতৃত্ব মতবাদ আবার তুলে ধরে বিপরীত বিষয়, যেমন–জনগণ কখনও আস্থা হারায় তত্ত্ব, সংঘ ও নেতার উপর। এই অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, জনগণের কিছু অংশ বিবৃত হয় মৌলিক ইস্যু নিয়ে, যা সমাজের উপর অতিরিক্ত চাপ বৃদ্ধি করে। মূলত রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে কোন ধরণের প্রতিবন্ধকতা দূর করবে তা হোকনা নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার, দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্তি, তথ্য প্রবাহের স্রোত। এখানে নেতা আরো নমনীয়, সহায়ক মানসিকতার হবেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোকে এক বিন্দুতে নিয়ে তাদের যে কোন জরুরী সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন।

২.১.৪(ঙ) রূপান্তরিত নেতৃত্ব (Transformational Leadership) ঃ

রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতি বা ধরণকে আমাদের পাঠ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করেছেন Mac Gregor Burns, আর তা হচ্ছে Transformational leadership বা রূপান্তরিত নেতৃত্ব। Burns বলেন রূপান্তরিত নেতৃত্ব শুধু জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায় না বরং মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে নৈতিকতার পথে অগ্রসর

[১৭] Ibid, Page- 126
[১৮] Barbara, Kellermen, Reventing Leadership: Politics and Business, State University Press, 1986, Page- 95.

Dhaka University Institutional Repository

হয়।[১৯] বর্তমান যুগের নেতৃত্ব বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন Tranformational laeadership বা রূপান্তরিত নেতৃত্ব সামাজিক গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীল সমাজের জন্য খুবই উপযুক্ত। কারণ এই রাজনৈতিক নেতারা শুধু গণতান্ত্রিক সমাজের দিক নির্দেশনা হিসাবে কাজ করেন না, জনগণের চাহিদাকে গুরুত্ব দেন সবচেয়ে বেশি। রাজনৈতিক নেতাদের উচিৎ শুধুমাত্র রাজনৈতিক উন্নয়নের চেয়ে আরো বড় সামাজিক লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা। তাদের যোগ্যতা থাকতে হবে নিজের জন্য নৈতিক কর্তৃপক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সামাজিক পদ্ধতিগুলোকে সুসংগঠিত করে অর্থনৈতিক ও সামজিক উন্নয়ন সাধন করা।[২০] এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি রাজনৈতিক নেতৃত্বের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য। যদিও সংস্কৃতিতে নেতৃত্বের ভূমিকা দীর্ঘ ও জটিল। কিন্তু নেতৃত্বের জন্য সংস্কৃতির ভিত্তি গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকা, চীন, জাপান, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে সংস্কৃতিতে বিভিন্নতা রয়েছে এবং সেই বিভিন্নতার প্রতিফলন রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর পড়ে।

অতএব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব বলতে বুঝায় সেই ব্যক্তিকে যিনি হবেন জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক। সামাজিক পরিবর্তনে, সমাজের মধ্যে গণতন্ত্রায়নে রাখবেন বলিষ্ঠ ভূমিকা। যার থাকবে সততা, নৈতিক আদর্শ, সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা, সমাজের সকল শ্রেণী, পেশা, সংস্কৃতির প্রতি সমর্থন, আত্মবিশ্বাস, বিচক্ষণতা, দক্ষতা, জনগণের প্রতি সচেতনতা এবং অবশ্যই জবাবদিহিমূলক আচরণ।

২.২ নেতৃত্বের সংজ্ঞা ঃ

নেতৃত্ব বলতে কি বুঝায়, সে সর্ম্পকে সমাজবিজ্ঞানের, নৃ-বিজ্ঞানের ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নেতৃত্বের যে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমরা করেছি তাতে মোটামুটি নেতৃত্ব সম্পর্কে তত্ত্বীয় ধারণা পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রতিটি বিষয়ের একটা সুনির্দিষ্ট কাঠামো থাকতে হয়, যা সংজ্ঞা আকারে সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ করা যায়। তেমনিভাবে আমরা বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানীর নেতৃত্ব

---

[১৯] Mac Gregor Burns, Transformational Leadership, Sorce book, Brand M. Boss, Tranformational Leadership, Lawrence, Erbaven Publishers New Jersey, 1998, Page- 29.
[২০] Ibid, Page- 51.

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে ধারণার সার সংক্ষেপের মাধ্যমে নেতৃত্বের যে সব সংজ্ঞা পেয়েছি তা নিম্নরূপ ঃ

১. নেতৃত্ব এক ধরণের যোগ্যতা যা নারী পুরুষকে কোন একটি সার্বজনীন উদ্দেশ্যে পরিচালিত করে।[২১]

২. কাঙ্খিত লক্ষ্যে জনগণকে প্রভাবিত করার দৃঢ় যোগ্যতাই হচ্ছে নেতৃত্ব।[২২]

৩. সামাজিক অবস্থানের কিংবা পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা মোটানোর জন্য সম্পাদিত যে কাজ তাই নেতৃত্ব।

৪. নেতৃত্ব হচ্ছে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের কর্তৃত্ব অর্জনের অধিকার ও অনুশীলন।

৫. দলীয় কাজ সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত করার যোগ্যতাই হচ্ছে নেতৃত্ব।

৬. গন্তব্য নির্ধারণ এবং গন্তব্যে পৌঁছার সঙ্গে কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য দলকে প্রভাবান্বিত করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে নেতৃত্ব।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট হয় ঃ
প্রথমত, যেখানেই দল বা গোষ্ঠী রয়েছে, সেখানেই রয়েছে নেতৃত্বের অস্তিত্ব। অতএব সামাজিক যুক্তির একটি বিশেষ প্রক্রিয়া হিসাবে নেতৃত্বকে বিবেচনা করা যায়। যার মাধ্যমে দলীয় সদস্যরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও মূল্যবোধের আলোকে সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে। নেতার চিন্তা, চেতনা ও আচরণের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়ে ওঠে দলের আদর্শ, লক্ষ্য ও বাস্তব কর্মপন্থা।

দ্বিতীয়ত, নেতাকে শুধু একজন সদস্য হলেই চলবেনা, অন্যান্য সদস্যের তুলনায় তাকে হতে হবে সর্বোত্তম সদস্য। নেতার সাহস, ত্যাগ, চারিত্রিক শুদ্ধতা ও সততার কারণে তিনি দলের সদস্যদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে উজ্জলতম হয়ে উঠেন।

---

[২১] Piyors, Leadership on Domination, Miffin, 1935, Page-27.
[২২] Cartwriaht, John, Political Leadership in America, Croomhelm,London, 1983, Page-214.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ত, একজন নেতাকে দলীয় সদস্যদের আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ, ব্যাথা-বেদনাসহ যাবতীয় অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা রাখতে হয়। অন্য কথায়, নেতা ও দলীয় কর্মী বা সদস্যদের মধ্যে আত্মিক ও মানসিক ব্যবধান যতই কম থাকে নেতার স্বার্থকতা ততই বেশী।

চতুর্থত, একজন নেতাকে হতে হয় দক্ষ নীতি নির্ধারক, প্রশাসক ও সংগঠক এবং তার দৈনন্দিন কার্যাবলী এমন হতে হবে যাতে করে দলীয় সদস্যরা তাকে একটি আদর্শ হিসাবে অনুকরণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

পঞ্চমত, নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তিকে নিজ দল বা গোষ্ঠীর ঐক্যের মূর্ত প্রতীক হিসাবে দলীয় সদস্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হয়।

সুতরাং নেতৃত্ব হচ্ছে নেতার ক্ষমতার বিষয়, নেতার আচরণের ও কৌশলের ব্যাপার এবং নেতার গ্রহণযোগ্যতা ও অন্যকে প্রভাবিত করার বিষয় যা একইভাবে অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য, ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে অনুসারীকে নেতার লক্ষ্যের প্রতি অনুগত হওয়ার জন্য প্ররোচিত বা প্রভাবিত করার গুণাবলী।[২৩]

২.৩ নেতৃত্বের মাত্রা ঃ

নেতৃত্বের মোট নয়টি মাত্রা নির্দেশ করা যায়। এগুলো হলো ঃ

১. উদ্যোগ (Initiative)– নেতা কতখানি নতুন ধারণা প্রদান করতে পারেন।

২. সদস্য বৈশিষ্ট্য (Membership)– নেতা কতটা নিয়মিতভাবে দলের সাথে মিথস্ক্রিয়া (Interaction) করেন।

৩. প্রতিনিধিত্ব (Representation)– নেতা দলের উদ্দেশ্য সাধন ও স্বার্থ রক্ষায় কতখানি আগ্রহী এবং বাইরের আক্রমন থেকে দলকে রক্ষা করেন।

---

[২৩] সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, সমাজ মনোবিজ্ঞান, ব্যানার্জি পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

৪. সংহতি (Integration)– দলের মাঝে সদস্যদের সম্প্রীতিকে উৎসাহিত করা এবং অভ্যন্তরীণ বিভেদ দূর করা।

৫. সংগঠন (Organization)– সংজ্ঞাদান, পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিজের ও দলের কাজ সুগ্রথিত (Structure) করা।

৬. প্রাধান্য (Domination)– দলের সদস্যদের সিদ্ধান্ত ও মতামতের উপর প্রভাব বিস্তার করা।

৭. যোগাযোগ (Communication)– সদস্যদের সাথে তথ্য বিনিময় করা।

৮. স্বীকৃতি (Recognition)– সদস্যদের সমর্থন লাভের জন্য নেতার বিভিন্ন আচরণ।

৯. উৎপাদন (Production)– কৃতিত্ব অর্জনের জন্য লক্ষমাত্রা নির্ধারণ।

২.৪ নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী ঃ

নেতা তিনি যে কোন সামাজিক গোষ্ঠীর বা রাজনৈতিক দলেরই হোক, প্রথমে তিনি দলের সদস্য, তারপর নেতা। অপরাপর সদস্যদের সাথে নেতার অবশ্যই কিছু সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। তার এই পৃথক বৈশিষ্ট্য তাকে নেতৃত্বের স্বীকৃতি এনে দেয়। নেতৃত্বের এসব অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। নেতার ক্ষমতা ও শক্তির পিছনে কোন গুণগুলো ক্রিয়া করে তা মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে নিম্নবর্ণিত আলোচনার মাধ্যমে।

১.ব্যক্তিত্ব ঃ

নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম গুণ হচ্ছে নেতার ব্যক্তিত্ব। অনেক সময় ব্যক্তিত্বের দৈহিক গুণাবলী পরিমাপ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, তাকে সুগঠিত হতে হবে, কিন্তু এ ধারণা যুক্তি সঙ্গত নয়, কেননা সামাজিকভাবে নেতার মধ্যে দৈহিক গুণাবলীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও রাজনৈতিক ও ধর্ম সম্পর্কীয়

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সহানুভূতি এবং সংগ্রামী মনোভাব থাকা প্রয়োজন। সুতরাং ব্যক্তিত্বের প্রকাশ শুধু দৈহিক নয়, মনস্তাত্ত্বিকও হতে হবে।

২. দক্ষতা ঃ

কোন সুনির্দিষ্ট দক্ষতার কথা বলা যায় না, যা ব্যক্তিকে নেতায় পরিণত করে। নেতৃত্ব ব্যক্তির কোন একটি বৈশিষ্ট্যমূলক মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে। এ কথাও বলা চলে কোন পরিস্থিতিতে যা উত্তম নেতৃত্ব, অন্য পরিস্থিতিতে তা-ই ব্যর্থ নেতৃত্ব। মূলত দক্ষতা বলতে বুঝায় উপস্থিত সমস্যার সমাধানে যিনি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সফলতা লাভ করেন। অর্থাৎ দক্ষতার মধ্যে থাকে উদ্যোগ, বুদ্ধিমত্তা, দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণ করার ক্ষমতা।

৩. আত্মবিশ্বাস ঃ

নেতৃত্বের অত্যাবশ্যকীয় গুণ হচ্ছে নিজের প্রতি আস্থা বা আত্মবিশ্বাস। নেতার নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্তে অবিচল থাকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাকে স্বাতন্ত্র্য এনে দেয়। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে কর্মপন্থা নির্ধারণ, জনগণকে আকৃষ্ট করা, মানসিক শক্তি ইত্যাদি গুণাবলীর সমন্বয়ে যে কোন সামাজিক ক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে নেতৃত্ব দৃঢ়তা পায়।

৪. সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা ঃ

যিনি নেতা, সে যে সমাজের হোক না কেন, তাকে তার সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে হবে, এবং মূল্যবোধগুলোকে বিকশিত করে সমাজের সভ্যদের আরো সুসংগঠিত করতে হবে। নেতার বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তিনি মূল্যবোধগুলোকে যুগোপযোগী করে সমাজের সকল শ্রেণীকে তার অন্তর্ভূক্ত করতে বদ্ধপরিকর থাকেন।

৫. প্রভুত্ব করার ক্ষমতা ঃ

মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন কতগুলো ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে, যার দ্বারা নেতৃত্বের সম্ভাবনা নির্ধারিত হয়। যে গুণগুলোকে অনেকাংশে পরিস্থিতি নিরপেক্ষ বলা চলে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই বৈশিষ্ট্যগুলো হল কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব

Dhaka University Institutional Repository

করার ক্ষমতা। এই ক্ষমতার মধ্যে পড়ে দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার ক্ষমতা, চিন্তার দৃঢ়তা দ্বারা পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিয়ে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসার ক্ষমতা।

মূলতঃ নেতা যে কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে সর্ম্পক নিয়ন্ত্রণ করে। উপরোক্ত চাহিদাগুলো পরিপূরণের মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিত্ব কতখানি বিকশিত করতে পারছেন তার দ্বারাই তাঁর নেতৃত্ব মূল্যায়ন করতে হবে। সামাজিক মনোবল, ঐক্য ও আর্দশ রক্ষা করার ক্ষমতা নেতার যেমন প্রয়োজন, তেমনি নীতি নির্ধারণ, কর্মসূচির বাস্তবায়ন, প্রয়োজনমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অভ্যন্তরীণ সর্ম্পক নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও নেতার থাকা দরকার। যেকোন সমাজ ব্যবস্থায় নেতাকে অবশ্যই প্রয়োজন উপযোগী হতে হবে। যেমন গণতান্ত্রিক সমাজের নেতা অবশ্যই গণতন্ত্রমনা হবেন এবং গণতন্ত্র সর্ম্পকে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা থাকবে।

২.৫ নেতার কাজ ঃ

নেতা যে সমাজের বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার নেতৃত্ব দেন, তিনি অবশ্যই কতগুলো পদ্ধতিগত দিক মেনে চলেন। যদি তিনি প্রভূত্ব ব্যঞ্জক কোন দলের নেতৃত্ব দেন তবে তাঁকে কতগুলো বিশেষ ধরণের কাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। আবার গণতান্ত্রিক দলের প্রকৃতি যাই হোক না কেন সব নেতাকে কতগুলো সাধারণ কাজ করতে হয়। নিম্নে সেগুলোর উপর আলোকপাত করা হলো ঃ

১. সমন্বয় সাধন করা ঃ

যেকোন দলের নেতাকে দলীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়, দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যাতে বাস্তবায়িত হয় তার জন্য নেতাকেই যত্নশীল হতে হয়। সব কাজই যে নেতা একা করবেন তা নয়। তবে নেতাকে প্রয়োজনীয় কাজের সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য দলীয় সদস্যদের ভিতর দায়িত্ব অর্পন করে দিতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২. পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ

দলের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন– এই দুইয়ের মধ্যবর্তী হল পরিকল্পনা প্রণয়ন। নেতাকে অনেক সময় এই পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। দল কিভাবে তার লক্ষ্যে উপনীত হবে তার উপায় নির্ধারণ করতে হয় এবং এজন্য নেতাকে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা তৈরী করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতাই এই পরিকল্পনার তত্ত্বাবধায়ক। তিনি পুরো পরিকল্পনার সকল দিক সম্পর্কে অবগত থাকেন। কিন্তু দলের সদস্যরা অংশবিশেষ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন। অনেক সময় সমগ্র পরিকল্পনার বিষয়ে তারা কিছুই জানেন না।

৩. নীতি নির্ধারণ ঃ

সুনির্দিষ্ট নীতি প্রতিটি দলেরই থাকে। এই সব নীতি নির্ধারণের উপর দলের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। নীতি নির্ধারণ দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপায়। এই লক্ষ্য নির্ধারিত হয় তিন ভাবে। কোন বাইরের কর্তৃপক্ষ যেমন– সরকার এই লক্ষ্য স্থির করে দিতে পারেন। দলের অধিকাংশ সদস্যের গৃহীত সিদ্ধান্তের দ্বারা এই লক্ষ্য নির্ধারিত হতে পারে। অথবা নেতা নিজে থেকে এই লক্ষ্য স্থির করতে পারেন।

৪. বিশেষজ্ঞের ভূমিকা গ্রহণ ঃ

অনেক সময় নেতাকে বিশেষজ্ঞের কাজ করতে হয়। দলের সদস্যদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তাকেই সরবরাহ করতে হয় এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ তাঁকে দিতে হয়। নেতারা যে সকল বিষয় জানেন এমন কোন কথা নেই। আবার বিশেষ কোন বিষয়ে জানতে যদি সদস্যরা আগ্রহী হয়ে ওঠেন সে সম্পর্কে নেতার বিশিষ্ট জ্ঞান নাও থাকতে পারে। কিন্তু দলের কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেই সম্পর্কে বিশিষ্ট প্রয়োজনগুলো মেটানোর জন্য নেতাকে সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করা হয়। বিশিষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় কোন ব্যক্তি অনেক সময় দলের নেতা নির্বাচিত হন। অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন ক্রীড়াবিদ ক্রিড়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নির্বাচিত হওয়ায় দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। সেভাবেই বয়স্ক ব্যক্তিরা নিছক জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে নিজের দলের উপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫. অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা ঃ

নেতার কাজের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা, দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা। যেকোন ছোট খাটো বিষয় সম্পর্কে নেতাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়। কারণ নেতার কাজের উপর নির্ভর করে দলের গতি-প্রকৃতি।

৬. পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা ঃ

দলীয় শৃংখলা বজায় রাখার জন্য পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যকীয়। এই পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান কোন বাহ্য বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন– দলপতি প্রাপ্ত আর্থিক পুরস্কার দলের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারেন। আবার কোন বিশেষ ভূমিকার জন্য ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা হয়, কখনও বা শাস্তি প্রদান করা হয়। যেমন– কোন দলীয় সদস্য দলের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন, এমন কোন বিশেষ কাজের জন্য সম্মাননা দেওয়া হয়। আর অনুরূপভাবে দলীয় শৃংখলা ভঙ্গ অথবা কোন দুস্কর্মের জন্য দল থেকে বহিস্কার করা হয়।

৭. দলীয় ঐক্যের প্রতীক ঃ

কতগুলো উপাদান আছে যেগুলোর মাধ্যমে সংগঠনের সদস্যরা নেতাকে দলীয় ঐক্যের প্রতীক রূপে গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে দলীয় সদস্যরা নিজেদের মধ্যে একাত্মতা অনুভব করেন। যেমন-পরিচয় জ্ঞাপক স্মারক, নাম অথবা পোশাক প্রভৃতি গোষ্ঠির ঐক্যের বোধক যা দলের প্রতীক হয়ে যায় অনেক সময়। এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের রানীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি একটি গোষ্ঠীর প্রতীক রূপে কাজ করেন। আবার নেতা এককভাবে দলীয় প্রতীক রূপে কাজ করে দলের নিরবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখেন। এক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি সুদীর্ঘকাল ধরে তার পদ অধিকার করে থাকেন, যদিও ব্যক্তিগত সভ্যদের বহু পরিবর্তন ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

৮. দলীয় ভাবধারার উৎস রূপে ক্রিয়া করা ঃ

নেতা শুধু যে দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করবেন বা নীতি নির্ধারণ করবেন তা নয়। তিনি দলীয় মূল্যবোধগুলোকে সদস্যদের কাছে তুলে ধরেন। তিনি দলীয় কর্মীদের ভাবধারা ও বিশ্বাসের উৎস রূপে ক্রিয়া করেন।

৯. দলে পিতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ ঃ

দলীয় সদস্যরা নেতাকে পিতাতুল্য বলে মনে করেন। মনোবিশ্লেষকরা মনে করেন যে, নেতা হলেন পিতার প্রতিভূ যার প্রতি সদস্যদের পিতৃসুলভ আবেগ ধাবিত হয়। ব্যক্তির আবেগ ও অনুভূতির কেন্দ্রবিন্দু হলেন নেতা। তাই সভ্যরা মনে করেন নেতাই হলেন উপযুক্ত ব্যক্তি যার সঙ্গে তারা একত্রিত হবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন; যার মাধ্যমে তাদের আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশিত হতে পারে। যার প্রতি তারা আনুগত্য বোধ করতে পারে। কোন নেতা তাঁর দলের উপর প্রবল ক্ষমতা রাখেন। তার মূলে থাকে নেতার সঙ্গে দলীয় সদস্যদের অনুপম সম্পর্কের সাযুজ্য।

২.৬ নেতৃত্বের উদ্ভব ও বিকাশ ধারা ঃ

কখন নেতৃত্বের উদ্ভব হয়েছে তা আলোচনা করা প্রয়োজন। আদিমকালে দেখা যায় গোষ্ঠীর সদস্যরা গোষ্ঠীর নিরাপত্তা, ঐক্য এবং খাদ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ইত্যাদির কারণে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, শক্তিশালী, কৌশলী ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল হতো। ফলে গোষ্ঠীর নেতৃত্বের দায়িত্ব এসে পড়ত তাঁর উপর। এবং সেই নেতার মধ্যে লক্ষ্য করা যেত প্রভূত্বব্যঞ্জক মনোভাব। এই প্রভূত্ব সুলভ নেতৃত্ব পরবর্তীতে বিকশিত হয়ে বংশ পরম্পরায় রূপ নেয়। অর্থাৎ পিতার নেতৃত্বের উত্তরসুরি পুত্র হতো। এভাবে নেতৃত্ব বিকশিত হতে হতে বর্তমানে গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের সর্বাধিক জনপ্রিয়তা ও স্থায়িত্ব পেয়েছে। তাই আমরা গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথমত ঃ

যে কোন ধরণের সংগঠন বা গোষ্ঠীর গঠন ও বৃদ্ধি থেকেই নেতৃত্বের উদ্ভব হয়। গোষ্ঠী গঠনের শুরু থেকেই ব্যক্তি অপরের তুলনায় বেশি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার মানসিকতা পোষণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এর ফলেই নেতা এবং যারা নেতা নন এ দু'দলের মধ্যে পার্থক্য শুরু হয়ে যায়। ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে শিশুরা পরস্পরের সঙ্গে কোন প্রতিক্রিয়া করে না। দ্বিতীয় স্তরে নিকট প্রতিবেশির সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোন কর্তৃত্বের ভাব থাকে না। তৃতীয় স্তরে এই কর্তৃত্বের ভাব দেখাতে গোষ্ঠীর গঠন ও বৃদ্ধি থেকে নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। নেতৃত্বের শুরুতে যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়, পরবর্তীকালের তুলনায় নেতৃত্ব নির্ধারণে সেগুলো অধিকতর বৃহৎ ভূমিকা গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়ত ঃ

অস্থায়ী গোষ্ঠী সংগঠনের মধ্য থেকে নেতৃত্বের উদ্ভব হয়। অস্থায়ী গোষ্ঠী সংগঠনের মধ্য থেকে নেতৃত্বের আবির্ভাবের সম্ভাবনাও বেশি থাকে। অস্থায়ী গোষ্ঠীর সংগঠনের স্থায়ীত্ব বা দৃঢ়তা সংগঠনে রূপান্তরিত হবার স্বাভাবিক প্রবণতা বর্তমান এবং যে সব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে গোষ্ঠী এই স্থায়ীত্ব লাভ করে তার মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নেতার আবির্ভাব, অর্থাৎ নেতার আবির্ভাবের ফলেই অস্থায়ী গোষ্ঠী সংগঠনের রূপান্তর ঘটে।

তৃতীয়ত ঃ

সমস্যাজনক পরিস্থিতি থেকে নেতৃত্বের উদ্ভব হয়। যখন গোষ্ঠীকে একটি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, যখন অগ্রগতি ব্যহত হয় বা গোষ্ঠীর নিরাপত্তা ব্যুহ বিঘ্নিত হয় তখন গোষ্ঠীর সভ্যরা কোন এক ব্যক্তিকে তার সাহসিকতা, দক্ষতা, জ্ঞান, আত্মবিশ্বাস বা অন্য কোন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য বরণ করে। কারণ তারা মনে করে ঐ ব্যক্তি গোষ্ঠীকে তার সমস্যামূলক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে পারবেন, ফলে নেতৃত্বের আবির্ভাব হয়।

চতুর্থত ঃ

ব্যক্তিগত চাহিদার পরিপূরণ থেকে নেতৃত্বের উদ্ভব হয়। আমরা জানি, গোষ্ঠীর সভ্যদের নানা রকম চাহিদা আছে। গোষ্ঠীর মধ্যে এমন একজনের প্রয়োজন যিনি পুরস্কার ও দন্ড দানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, যিনি গোষ্ঠীর ঐক্য রক্ষার জন্য সচেষ্ট হবেন। যিনি তার আচরণ দ্বারা গোষ্ঠীর সভ্যদের সামনে আচরণের সৎ দৃষ্টান্ত তুলে ধরবেন। যিনি গোষ্ঠীর কৃতকর্মের দোষ-ত্রুটি নিজের উপর

Dhaka University Institutional Repository

তুলে নিয়ে তাদের সাময়িকভাবে অপরাধবোধ থেকে মুক্ত করবেন। এসব চাহিদা পুরণের জন্য নেতার আবির্ভাব ঘটে। যখন কোনো ব্যক্তির মধ্যে মর্যাদা, প্রতিপত্তি, স্বীকৃতি লাভের ইচ্ছা জাগে তখন ব্যক্তির এসব চাহিদা পুরণের জন্যেও নেতৃত্বের আবির্ভাব হয়।

অবশেষে আমরা এটাও বলতে পারি যে, নেতার প্রয়োজনেই নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। কোনো গোষ্ঠী কোন এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তার নেতার প্রয়োজন। বস্তুত নেতার চাহিদা হলো প্রভূত্বের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি, আর যে গোষ্ঠীকে তিনি পরিচালিত করেন সেই গোষ্ঠীর চাহিদা হলো বশ্যতা স্বীকার করা। এভাবেও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, একটি অসংগঠিত জনগোষ্ঠীর লক্ষ্যাভিমুখী উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কার্যকর নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই। কিন্তু সমাজের সর্বক্ষেত্রে আজ এমন একটি সংস্কৃতি বিরাজ করছে, যেখানে যোগ্যতার মাপ কাঠিতে নয় বরং অন্যকিছুর ভিত্তিতে নেতৃত্ব নির্ধারিত হয়। এটি রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনই প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশাসনিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ধর্মীয় ইত্যাদি নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। বাংলাদেশের সমাজ বিন্যাসে আজ বস্তুনিষ্ঠ উপাদানগুলো নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করলেও সহযোগী আত্মনিষ্ঠ উপাদানগুলো অনুরূপভাবে বিকশিত নয় বলেই জাতি আজ পর্যন্ত সঠিক নেতৃত্ব নির্বাচনে যুক্তি, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে পারেনি। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থাৎ সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে কোন পর্যায়ে যোগ্যতাকে নেতৃত্বের মাপকাঠি হিসাবে বিচার করার মানসিকতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটলেই প্রকৃত নেতৃত্ব গড়ে উঠবে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এর রয়েছে সুদীর্ঘ রাজনৈতিক পটভূমি। সেই বৃটিশ-ভারতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে পার্থক্যবোধ জনগণকে অধিকার সচেতন করে তুলেছিল, যা পরবর্তীতে তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে সহায়তা করেছিল। এই রাজনৈতিক বিকাশমান ধারায় ভারত, পাকিস্তানের; আবার একই রাজনৈতিক পথ পরিক্রমায় পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে জাতিগত প্রভেদের কারণে পূর্ব পাকিস্তান সশস্ত্র রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ ধারা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করলে তা অনেক বেশি সহজবোধ্য হবে।

৩.১ বৃটিশ আমল (১৮৮৫-১৯৪৭) ঃ

ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় এবং পরিচালনায় যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন সি আর দাস, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, সরদার বল্লব ভাই প্যাটেল, অম্বেদকার, মহত্মাগান্ধি ও জহর লাল নেহেরু।[১] তৎকালিন সময়ে রাজনীতিতে আগত ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশ ছিলেন জমিদার, রাজণ্য পরিবার ও সামন্ত শ্রেণীর সন্তান যারা মূলত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পেশাজীবী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এদের অধিকাংশ ছিলেন আইনজীবী আবার কেউ কেউ ছিলেন চিকিৎসক । এরা অভিজাত সমাজ থেকে আগত ছিলেন বটে, তবে তারা ছিলেন বয়সে তরুণ এবং প্রতিনিধিত্ব করতেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত উদীয়মান মধ্যবিত্ত পেশাজীবী শ্রেণীর। বৃটিশ ভারতে বহুভাষা, বহু ধর্ম ও বর্ণের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মূল

---

১. আহমদ, সা'দ, আমার দেখা সমাজ ও রাজনীতির তিনকাল, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা-২০০৬, পৃষ্ঠা-২২০।

Dhaka University Institutional Repository

অনপ্রেরণা ছিল সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ (হক ১৯৯২:১)।[২] কিন্তু রাজনৈতিক বিবর্তনে ধর্মীয় উপাদানই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন সবাই উচ্চ বর্ণের হিন্দু (যদিও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে সীমিত সংখ্যক মুসলিম নেতাকে স্থান দেওয়া হয়েছিল)। পাশাপাশি ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে আদর্শগত এবং সাংগঠনিকভাবে হিন্দুবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মহাত্মা গান্ধীর মানবতাবাদী ও আর্দশভিত্তিক নীতিমালায় স্থান করে নেয়া অসহযোগ এবং অহিংস আন্দোলনের উৎস অহিংসা নামক হিন্দু ধর্মীয় প্রত্যয়ে নিহিত ছিলো (আহমেদ ১৯৯২:৬)।[৩] উনিশ শতকের শেষে বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক উন্মেষ ঘটেছিলো তার ভিত্তি হিসাবে নির্দেশিত হয়েছিল ধর্ম এবং ধর্মভিত্তিক সাপ্রদায়িক স্বার্থ চেতনা। সর্বভারতীয় পরিসরে এমন ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার কারণে ভারত বিভক্তি অনিবার্য ছিল, এমন একটি বক্তব্য ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হয়েছে (হোসেন, ১৯৯৮:১৯)।[৪] গান্ধী যদিও রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ হিসাবে মুসলমানদের খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর বাংলাদেশের ইতিহাস গ্রন্থের চতুর্থ খন্ডে লিখেছেন, গান্ধীর সাহায্য সমর্থনে এই আন্দোলন (খিলাফত) প্রবল হইয়া উঠিল, গান্ধী এই আন্দোলনকে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলিলেন এবং ১৯২০ সালের প্রথমে খিলাফত আন্দোলনই তাঁহার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হইল, তাহার নেতৃত্বে অনেক হিন্দুও যোগ দিলেন (রাব্বানী, ২০০৮:৯)।[৫] অবশ্য খিলাফত আন্দোলনের অনেক আগেই মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক দল হিসাবে মুসলিম লীগ ১৯০৬ সালে নবাব সার সুলিমুল্লাহ–এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ সময় কংগ্রেস থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান নেতা বের হয়ে এসে মুসলিম লীগে যোগ দেন।

---

২ হক, আবুল ফজল, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, টাউন ষ্টোর্স, রংপুর, ১৯৯২

৩. আবুল মনসুর, (আহমদ), আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা-১৯৭৫।

৪. হোসেন, ড. সৈয়দ আনোয়ার, বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ প্রেক্ষাপট প্রকৃতি প্রতিফলন, বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর (তারেক শামসুর রহমান সম্পাদিত), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৯।

৫. রাব্বানী, মোহাম্মদ গোলাম, ধর্ম বনাম অধর্মের বিচার, প্রথম আলো, ঢাকা, ১৫ জুলাই, ২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন লিয়াকত আলী খান, চৌধুরি খালেকুজ্জামান, ব্যারিস্টার নুরুল আমীন। এরাও সবাই ছিলেন জমিদার সামন্ত শ্রেণী থেকে আগত।[৬] এরা প্রতিনিধিত্ব করতেন মধ্যবিত্ত পেশাজীবীদের। ভারতীয় মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক বিবেককে ভিত্তি করে জিন্নাহ ঘোষণা দেন "ভারতের হিন্দু মুসলমান দুই স্বতন্ত্র জাতি, তাদের ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি পরস্পর থেকে ভিন্ন, আর্থ সামাজিক স্বার্থও ভিন্ন"[৭] (রফিক, ১৯৯৪:৯৪)।

৩.২ পাকিস্তান যুগে (১৯৪৭-১৯৭১) ঃ

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে (১৯৪৭-১৯৭১) পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল (আহমদ, ২০০৪:৭৮৬)। রাজনীতিতে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হলেও পাকিস্তানের গণ পরিষদে প্রদত্ত সভাপতির প্রথম অধিভাষণে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন,

You are free, you are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other place of worships in this state of Pakistan. You may belong to any religion or cast or creed that has nothing to do with the fundamental principles that we are all citizen and equal citizen of our state. In course of time. Hindus will cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in political sense as citizens of the state (খান, ১৯৯৯:২৪০)।[৮] এভাবে জিন্নাহ প্রথম সুযোগে দ্বি-জাতি তত্ত্বকে বিসর্জন দেন। যতটুক আঁচ করা যায় তাতে ধর্মীয় আর্দশবাদ ছিল মূলত রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া। পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুটি বিভাগ যথা ঃ

১. পশ্চিম পাকিস্তান (যার অন্তর্গত ছিল ৪টি প্রদেশ)
২. পূর্ব পাকিস্তান (যার অন্তর্গত ছিল একটি মাত্র প্রদেশ– পূর্ব বাংলা)

---

৬. আসাদ, আবুল, একশ বছরের রাজনীতি, বিসিবিএস, ঢাকা, আগষ্ট ২০০৫।
৭. রফিক, আহমদ, "সাতচল্লিশের ভারত বিভাগ ও বাংলাদেশের বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তিক পরিস্থিতি", বাংলাদেশের ধর্ম সাম্প্রদায়িকতা সংকট, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, ঢাকা, ফ্রেব্রুয়ারী ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২১।

৮. খান, আবেদ, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতা, বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার সংকট (সৈয়দ আমীরুল ইসলাম ও কাজল বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত) জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা , ঢাকা, ফ্রেব্রুয়ারি, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২৪০।

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল কেন্দ্রিয় সরকার। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পূর্ব পাকিস্তান ৭০% মুসলিম অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের প্রতি যথেষ্ট বৈষম্যমূলক আচরণ করতে থাকে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের সুষম অধিকার আদায়ের জন্য পৃথক রাজনৈতিক দলগঠনে বাধ্য করেছিল। কারণ, শুরু থেকেই পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রতি বেশি মনোযোগী ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলিম লীগ নেতাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণে দেখা যায় এরা সবাই এসেছিলেন জমিদার সামন্ত পরিবার থেকে। এরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, পেশাজীবী (ব্যবসায়ী) ছিলেন। এসময় জুলফিকার আলী ভুট্টো পিপলস পার্টি গঠন করে গণতন্ত্রায়নের কথা বলতে থাকলেও তিনি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। তার রাজনৈতিক কেন্দ্রভূমি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। অপর দিকে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্বে যে বেঙ্গল মুসলিম লীগ (Bengal Muslim League) ছিল তা আবার দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানপন্থী এবং পূর্ব পাকিস্তানপন্থী। পশ্চিম পাকিস্তানপন্থি নেতারা ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত, বয়সে প্রবীণ এবং এরা প্রতিনিধিত্ব করতেন উচ্চবিত্ত সমাজের। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানপন্থী নেতৃত্বে দেখা যায় নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব। এরা এসেছিলেন ধনী কৃষক শ্রেণী থেকে, এরা বয়সে প্রবীণ ও নবীন ছিলেন, এরা পেশায় ছিলেন শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী। এদেরকে উদীয়মান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত বলা যায়। এদেরকে রওনক জাহান তাঁর বই Pakistan: Failure in National Integration-এ Varnacular Elite বলেছেন।[৯] ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা দেখেছি যে, বাঙ্গালী মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারত বিভক্তির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। সেই British Bengal Muslim League আবার দুভাগে বিভক্ত ছিল। তাদের কাজের ধরনও দুভাগে বিভক্ত ছিল, যা নিম্নে লেখ চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো ঃ[১০]

---

৯. Jahan, Rownaq, Pakistan failure in national integration, university Press, 2005, page-72.

১০. আহমেদ, কামরুদ্দিন, পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, মাওলা বাদ্রার্স, ঢাকা, মার্চ-২০০২, পৃষ্ঠা-১৯২।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ আমলে বঙ্গের মুসলিম লীগের নেতৃত্ব

British Bengal Muslim League

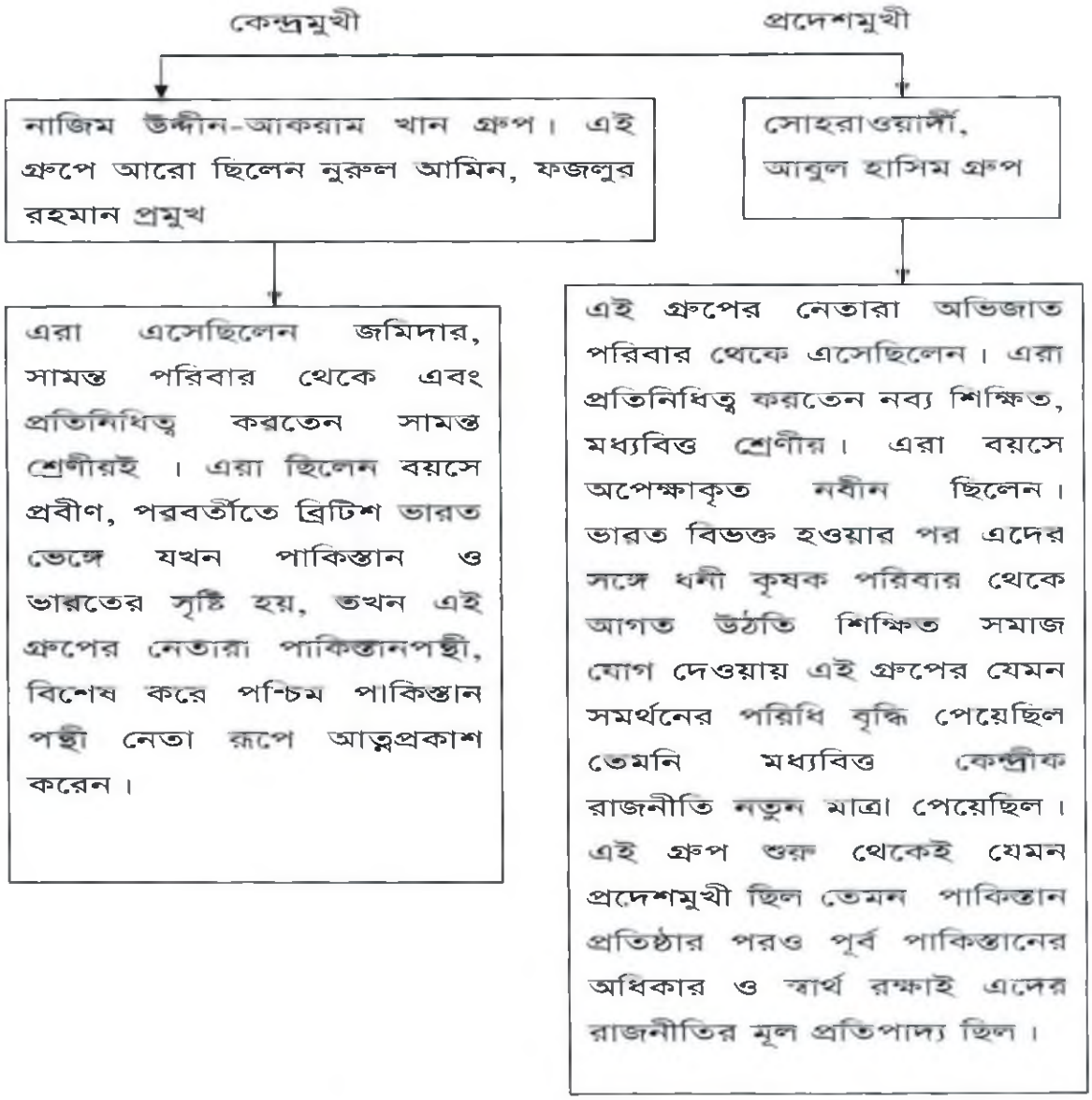

পরবর্তী সময় যখন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক চক্র পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বৈষম্যমূলক আচরণ করতে থাকে তখন এই সোহরাওয়ার্দী – আবুল হাসিম গ্রুপের তরুণ নেতারা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ রক্ষায় মুসলিম লীগ আর যথেষ্ট নয় বলে মুসলিম লীগ ত্যাগ করে ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন– মাওলানা ভাসানী।
সহ-সভাপতি ছিলেন– আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমেদ।
সাধারণ সম্পাদক ছিলেন– শামসুল হক।
যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন– শেখ মুজিবর রহমান ও খন্দকার মোস্তাক আহমদ।

ভাসানী বাদে এরা সবাই ছিলেন বয়সে নবীন, ধনী কৃষক শ্রেণী থেকে আগত, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। এ সময় রাজনীতিতে ছাত্র সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল। যার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল।[১১]

পূর্ব বাংলার পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন পাকিস্তানপন্থী বেঙ্গল মুসলিম লীগের জন্য একটা বড় ধরণের ধাক্কা ছিল। তার প্রমান মেলে ১৯৪৯ সালের ২৫ এপ্রিল দক্ষিণ টাঙ্গাইলের উপ-নির্বাচনে।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রথম পূর্ব বাংলায় নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থী ছিলেন প্রখ্যাত জমিদার খুররম খান পন্নী এবং ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের প্রার্থী হন যুব নেতা শামসুল হক।[১২]

এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এর পর মুসলিম লীগ সরকার ১৯৫১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশে নির্বাচন করলে পূর্ব বাংলার ৩৫টি আসন শূন্য থাকা সত্ত্বেও ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত এই প্রদেশে নির্বাচন বন্ধ রাখেন। ১৯৪৯ এর নির্বাচনের ফলাফল পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক দলগুলোসহ ছাত্র সমাজকে সংগঠিত হওয়ার নব প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে। এ ছাড়া ১৯৪৮ সাল থেকে মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের দাবী ১৯৪৯-এর উপ-নির্বাচনের পর আরো জোরালো হতে থাকে, যার চরম প্রকাশ ঘটে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন থেকে। ভাষা আন্দোলনে ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এদের মধ্যে নেতৃত্বে ছিলেন অলি আহাদ, আব্দুল মতিন,

---

[১১] আহমদ, আবুল মনসুর, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, আগষ্ট ১৯৭৫, পৃষ্ঠা- ১২১

[১২]. কাদের, আহমেদ আব্দুল, বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও ধর্ম নিরপেক্ষতা, ইসলামী রাজনীতি, বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা-২০০৬, পৃষ্ঠা-৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

গাজীউল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, নুরুল হক, কমর উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।[১৩] তারা প্রতিনিধিত্ব করতেন ছাত্র, যুবক ও মধ্যবিত্ত পেশাজীবীদের। ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদানকারীরা একদিকে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত ছিলেন তেমনি বয়সে তরুণ ছিলেন। এ কারণে এদেরকে তালুকদার মনিরুজ্জামান youth league বলেছেন।[১৪] ভাষা আন্দোলনের সফলতার পর ১৯৫৪ সালে শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হকের পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক পার্টি, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানীর আওয়ামী মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি, গণতন্ত্রী দল ও খেলাফতে রব্বানী পার্টির সমন্বয়ে গঠিত যুক্ত ফ্রন্ট ২১ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। বিপুল বিজয়ের মধ্যে দিয়ে যুক্ত ফ্রন্ট প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করে। যারা এ নির্বাচনে বিজয়ী হন ব্যক্তিগত তথ্য পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, তারা অধিকাংশই ছিলেন বয়সে তরুণ এবং শ্রেণীগতভাবে নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। পেশায় উকিল, শিক্ষক, ছাত্র ছিলেন।[১৫] প্রাদেশিক সরকার গঠনের সুযোগ তরুণ মধ্যবিত্ত পেশাজীবী শ্রেণীর রাজনৈতিক অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করে। তারা রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত হয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন যেমন– শিক্ষা আন্দোলন, সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, অর্থনীতিবাদী আন্দোলন পরিচালিত করতে থাকেন। এসব আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারীরা ছিলেন সেই তরুণ নব্য শিক্ষিত পেশাজীবী ও ছাত্র সমাজ।[১৬] ১৯৬৬ সালের আওয়ামী লীগের ৬ দফা ছিল মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের সনদ। ৬ দফার এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার উপর ভিত্তি করে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছিলো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্ন্তগত ছাত্র, পেশাজীবীরা। যদিও ঐ সময়ে আন্দোলন হয়ে গিয়েছিল কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, পেশাজীবী তথা মধ্যবিত্ত মানুষের সঙ্গে গণ মানুষের আন্দোলন। তবে এসব আন্দোলনে উচ্চবিত্তদের শামিল হওয়ার নজির মেলেনি।

---

১৩. Talukder Moniruzzaman, The Bangladesh Revolution & its after Math University Press, page-36

১৪. শাকিল, এম জহিরুল হক, বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, প্রথম খন্ড, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৯, পৃষ্ঠা- ১৭৫।

১৫ দলিলপত্র, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্যমন্ত্রণালয়, ৩য় খন্ড, ১৯৮২, পৃষ্ঠা ২৬৭-২৭০।

১৬. দলিল পত্র, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রানালয়, ৩য় খন্ড, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-২৬৭-২৭০।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের পরবর্তী ফল হিসাবে আসে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রস্তাবনায় ছিল স্বায়ত্বশাসনের অধিকার। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় প্রমান করে দেয় পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ হয়ে থাকতে চায়না।[১৭] তাদের পৃথক ভূ-খন্ড, আলাদা ভাষা, ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল তাদেরকে নিজস্ব জাতি সত্ত্বার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশের সনদ ছিল ৭০–এর নির্বাচন। এই নির্বাচনে তরুণ নব্য শিক্ষিত পেশাজীবীদের সঙ্গে নতুনভাবে ব্যবসায়ী শ্রেণীকে নেতৃত্বে দেখা গিয়েছিল। মূলত এই নির্বাচনে যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন আইনজীবী, ডাক্তার, শিক্ষক, ট্রেড ইউনিয়নের নেতা এবং ব্যবসায়ী-(কন্ট্রাকটর এবং ইন্স্যুরেন্স মালিক), কৃষি জমির মালিক।[১৮]

১৯৬৯-৭০ এর নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতাদের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ ঃ[১৯]

সারণী ৩.১

জনমিতিক বৈশিষ্ট্য	সংখ্যা	শতকরা হার
বয়স		
৫০-৬০	৮জন	২৩%
৪০-৪৯	২৫জন	৬৭%
৩০-৩৯	৩জন	৮%
৩০ এর কম	১জন	২%
সর্বমোট	৩৭জন	১০০%

[১৭] . Huda, Muhammad, Nurul, Religion based politics and all that, The Daily Star, 23 November, 2007.
[১৮] . Talukder Moniruzzaman, The Bangladesh Revolution and its Aftermath, University Press, 2005, page-87.
[১৯] . Talukder Moniruzzaman, The Bangladesh Revolution and its Aftermath, University Press, 2005, page-87.

Dhaka University Institutional Repository

জনমিতিক বৈশিষ্ট্য	সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষা		
গ্রাজুয়েট	৩৩জন	৮৯%
উচ্চ মাধ্যমিক	১জন	৩%
উচ্চ মাধ্যমিকের নিচে	৩জন	৮%
সর্বমোট	৩৭জন	১০০%
ধর্ম		
ইসলাম	৩৭জন	১০০%
পেশা		
আইনজীবী	২১ জন	৫৭%
ব্যবসায়ী (কন্ট্রাকটর এবং ইনস্যুরেন্স মালিক)	১১ জন	২৯%
ট্রেড ইউনিয়ন নেতা	১ জন	৩%
কৃষি জমির মালিক	২ জন	৬%
স্কুল, কলেজ শিক্ষক	২ জন	৫%
সর্বমোট	৩৭ জন	১০০%

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফল অনুসারে ক্ষমতার বিধি বন্টন না হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতার দাবিতে জ্বলে উঠেছিল এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ যদিও গণযুদ্ধের রূপ নিয়েছিল, কিন্তু এ যুদ্ধের নেতৃত্ব ছিল মধ্যবিত্তের হাতে। তৎকালিন সামরিক বাহিনীর বাঙ্গালী কর্মকর্তারা এ যুদ্ধের বিভিন্ন সেক্টরে সেক্টর কমন্ডার হিসাবে নেতৃত্ব দেন এবং আরো যারা নেতৃত্ব দেন তারা ছিলেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা। অত:পর যুদ্ধে বিজয় আসে বাঙ্গালীর ঘরে। সৃষ্টি হয় স্বাধীন বাংলাদেশ।[২০]

৩.৩ বাংলাদেশ যুগে (১৯৭১-১৯৯০) ঃ

[২০]. Ball, Allan R, Modern Politics and Governments, London, The MacMillan, Press Ltd., 1977, Page-195.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীন বাংলাদেশের পথ চলার শুরুতে দেখা যায় স্বাধীনতা-পূর্ব রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধারা অনেকটাই বজায় ছিল। নব গঠিত বাংলাদেশে মধ্যবিত্তরাই রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছিল। যদিও পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে নতুন রাজনৈতিক শ্রেণী হিসাবে ব্যবসায়ীদের উপস্থিতি '৭০—এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের মধ্যে দেখা গেছে, তবুও '৭১ পরবর্তী রাজনৈতিক ধারায় স্বাধীনতা-পূর্ব মধ্যবিত্ত পেশাজীবী শ্রেণীর প্রভাব খুবই শক্তিশালী ছিল, যার প্রমান মেলে ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চের নির্বাচনে। কারণ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যকই ছিল আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক, ছাত্রনেতা, সাংবাদিক, যারা ছিলেন উদীয়মান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। যদিও আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে বিপুল বিজয় অর্জন করে কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে আরো অনেক নতুন প্রতিনিধিত্বশালী দলের গুরুত্ব বর্ণনার দাবী রাখে।

তাই ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চের নির্বাচনের ফলাফল সারণীবদ্ধভাবে নিম্নে প্রদত্ত হলো।[২১]

সারণী ৩.২

দলের নাম	আসন সংখ্যায় প্রতিযোগী	বিজয়ী প্রার্থী	ভোটের শতকরা
আওয়ামীলীগ	৩০০	২৯২	৭৩.১৭%
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	২২৩	-	৮.৫৩%
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	২৩৬	১	৬.৪৮%
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)	১৬৯	-	৫.৪২%
স্বতন্ত্র, অন্যান্য	১৫০	৬	০.৩৮%
সর্বমোট	১০৭৮	২৯৯	১০০%

এই নির্বাচনে একটি আসনে নির্বাচন বন্ধ ছিল একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যুর কারণে, যা পরবর্তীতে পূর্ণ হয় আওয়ামী লীগের প্রার্থীর বিজয়ের মাধ্যমে।

[২১]. Bangladesh Overserver, March-8-10, 1973.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৩ সালের ৭-মার্চের সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের ফলে পাকিস্তান আমলে ব্যর্থ বহুদলীয় গণতন্ত্রের স্থলে সত্যিকারভাবে বহুদলীয় গণতন্ত্রের চর্চার পথ প্রশস্ত হয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের ফলে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য যে রাজনৈতিক পরিবেশ প্রয়োজন ছিল তা বাঁধাগ্রস্থ হয়। কারণ দেশের স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে পড়েন জনগণের প্রাণের মানুষ এবং আওয়ামী লীগ হয়ে যায় গণমানুষের একমাত্র দল। এর কারণ অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ইশতেহারে যেসব বিষয় ছিল তার মধ্যে দরিদ্র্য, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তি, রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিতকরণ সহ সময় উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ। অন্যান্য দল মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কর্মসূচী পরিচালনা করতে থাকলেও আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন স্বাধীনতার প্রবাদ পুরুষ। তার নেতৃত্বের কাছে অন্য দলের অস্তিত্ব ম্রীয়মান হয়ে যাচ্ছিল। সংগত কারণে, ১৯৭৩ সালের ৭-মার্চের সাধারণ নির্বাচন আওয়ামী লীগকে দেশ শাসনের একক ম্যানডেট এনে দিয়েছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথ চলা বাধাগ্রস্থ হয়। এক্ষেত্রে সংবিধানে ২য় ও ৪র্থ সংশোধনী দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগকে প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনসহ জরুরী ক্ষমতা দিয়ে ক্ষমতাশীল করা হয়।[২২] এর ফলস্বরুপ ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর জরুরী অবস্থা জারী করা হয় এবং কিছু মৌলিক অধিকারকে হাইকোর্টের এখতিয়ার বহির্ভূত রাখা হয়। এসব পদক্ষেপের ফল হিসাবে দেশে ১৯৭৫ সালে ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এক দলীয় রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়।[২৩] এতে জনগণ যেমন আশাহত হয়, অপরদিকে দেশের ভিতর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ঠিক এই সময়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান স্ব-পরিবারে নিহত হওয়ায় রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে।[২৪] দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে প্রথম সামরিক শাসন জারী হয়।

---

২২. নাথ, বিপুল রঞ্জন, বাংলাদেশের সাংবিধানিক রাজনৈতিক দল, বুক সোসাইটি, ঢাকা-১৯৮২, পৃষ্ঠা-৫০-৫১।

২৩. দলিলপত্র, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রনালয়, তৃতীয় খন্ড, ঢাকা ১৯৮২, পৃষ্ঠা- ৮৩৭।

২৪. আহমেদ, মওদুদ, বাংলাদেশের শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা-১৯৮২, পৃষ্ঠা-১১৯-১২১।

Dhaka University Institutional Repository

এমতাবস্থায় ১৯৭৫ সালের ৭-নভেম্বর অনেকটা আকস্মিকভাবে জিয়াউর রহমান ('৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর সেনা প্রধান) সিপাই-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ক্ষমতাসীন হয়ে দেশ গঠনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকেন।[২৫] যেমন প্রশাসনিক প্রয়োজনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদগুলো দক্ষ সামরিক উর্ধতন কর্মকর্তাদের দ্বারা পূর্ণ করেন, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক আমলাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখেন। এ সুযোগে সামরিক আমলাদের রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, তেমনই রাজনীতিতে আগ্রহও অনেক গুণ বেড়ে যায়। এতে করে রাজনীতিতে আরো একটি নতুন শ্রেণীর প্রারম্ভিক সূচনা হয়। জিয়াউর রহমানের শাসনকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে তিনি রাজনীতিকে সুসংহত করার প্রক্রিয়ায় তার সামরিক শাসনকে বেসামরিকিকরণের প্রচেষ্টা চালান। শুধু তাই নয় তিনি '৭৫ সালের স্থগিত হয়ে যাওয়া বহু দলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুনঃ প্রবর্তন করেন।[২৬] এ লক্ষ্যে তিনি ১৯৭৮ সালে সামরিক পদ ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করেন। বিএনপি গঠনে দেখা যায়, স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী অর্থাৎ '৭৫ সাল পর্যন্ত যে রাজনৈতিক ধারা চলে এসেছে তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রার দল গঠন করেন সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের এলিটদের (Elite) সঙ্গে নিয়ে। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক–বেসামরিক আমলা, উচ্চ শিক্ষিত শহুরে সুপ্রতিষ্ঠিত উচ্চ বিত্ত ব্যক্তিবর্গ এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী নামকরা চিকিৎসক, আইনজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তবে এই এলিট শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা কেউ বয়সে একেবারে তরুণ নন আবার প্রবীণও নন। এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন, আওয়ামী লীগ গঠিত হয়েছিল গ্রাম থেকে আসা নব্য শহুরে তরুণ পেশাজীবীদের নিয়ে, আর বিএনপি স্থায়ী শহরবাসী (যাদের পূর্ব পুরুষ গ্রাম থেকে এসে শহরে বসবাস করে আসছেন) ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। জিয়াউর রহমান রাজনীতিতে গণতন্ত্র ফিরিয়ে নিয়ে আসার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিকে সচল করতে সক্রিয় হন। এ লক্ষ্যে তিনি ব্যবসায়ী শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এ

---

[২৫]. নুর, আবদুন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান : একটি মূল্যায়ন, জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০, পৃষ্ঠা-৭৩।

[২৬]. হায়দার, আবুল কাশেম ও মাহমুদ, সোহেল, বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাস, নওয়াব সুলিমুল্লাহ থেকে খালেদা জিয়া, প্যানোরমা পাবলিকেশনস, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২০৬।

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগে ব্যবসায়ী শ্রেণী আবার নতুনভাবে রাজনীতিতে ঢুকে পড়ার সুযোগ পায়। এদের মধ্যে ছিলেন বৃহৎ শিল্পপতি, রপ্তানীকারক, আমদানীকারক, ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর মালিকসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ী। এরা মূলত নিজেদের সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার অভিপ্রায় নিয়েই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ব্যবসায়ীরা অনেকটা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিজস্ব প্যাটার্নে রাজনীতিকে পরিচালনা করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

তবে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান জনগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে সমাদৃত হন। যার প্রমান মেলে ১৯৭৯ সালের ১৮ ফ্রেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচনে। যেখানে বিএনপি ৩০০টি আসনের মধ্যে ২০৭টি আসন পায়। এবং প্রাপ্ত ভোটের ৪১.১৭% পায় বিএনপি। অপরদিকে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ৩৯ টি আসন ও প্রদত্ত ভোটের ২৪.৪৬%। বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপনের সুবিধার্থে নিম্নে সারণী আকারে ১৯৭৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য দলগুলোর নির্বাচনী ফলাফল তুলে ধরা হলো।[২৭]

সারণী ৩.৩

দল	মোট আসনে প্রতিদ্বন্দ্বি	প্রাপ্ত আসন	শতকরা ভোটের হার
বি এন পি	২৯৮	২০৭	৪১.১৭%
আওয়ামী লীগ	২৯৫	৩৯	২৪.৫৬%
জাসদ	২৪০	৮	৪.৮৩%
স্বতন্ত্র	৪২২	১৬	১০-১৯%

১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কতিপয় বিপথগামী সেনা সদস্যের হাতে নিহত হন। এরপর বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের পর জেনারেল এরশাদ সামরিক আইন জারীর মাধ্যমে দেশের সর্বময় ক্ষমতা দখল করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় সংবিধান স্থগিত করেন, নির্বাচিত জাতীয় সংসদ বাতিল করেন এবং

[২৭]. রেহমান, ড. তারেক শামসুর, জিয়াউর রহমানের বৈদেশিক নীতি, জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আর্দশ, মৌলী প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০, পৃষ্ঠা-৫৭-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করেন।[২৮] এরশাদ সরকার তার শাসন ব্যবস্থাকে বৈধতা দিতে বেসামরিকীকরণের কৌশল হিসাবে দল গঠন করেন। তিনি জিয়ার সরকারকে পূর্বসুরি হিসাবে গ্রহণ করে বিএনপি'র মতো অবসরপ্রাপ্ত সামরিক–বেসামরিক আমলা ও ব্যবসায়ীদের দলে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তবে এরশাদ সরকার কখনই জিয়া সরকারের মতো জনসমর্থন অর্জন করতে পারেনি। জনগণ তাকে কখনই প্রেসিডেন্ট জিয়ার মতো সমর্থন করেনি। এর পর ১৯৯০ সালে গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পতন হয়। ১৯৯০ সালে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসে।[২৯] এরশাদের স্বৈরশাসনের পতনের মধ্যে দিয়ে দেশে আবার বহুদলীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়।

সার্বিক ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্বের সূত্রপাত হয়েছিল সেই বৃটিশ আমল থেকে। যখন ভারত উপমহাদেশের জনগণ স্বাধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হওয়ার তাগিদ অনুভব করেছিল। প্রথম ভারতের রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসের আত্মপ্রকাশের জন্য যেসব সংগঠকগণ প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম বাঙ্গালী নেতা ছিলেন জমিদার জানকিনাথ বসু। আবার দেখা গেছে যে, ভারত বিভক্ত হওয়ার পিছনেও বাঙ্গালী মুসলমান নেতাদের জাতিগত সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষাই মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ভারত বিভক্ত হয়ে বাঙ্গালী মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল পূর্ব বাংলা পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্রের প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। পাকিস্তান আমলেও মুসলিম লীগ নেতাদের পূর্ব বাংলার (পূর্ব পাকিস্তান) জনগণের প্রতি অন্যায় অবিচার–এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে এবং সংগঠন থেকে বের হয়ে আসতে দেখা গেছে। যার পরিণামে ব্রিটিশ আমলের বেঙ্গল মুসলিম লীগ প্রথমে আওয়ামী মুসলিম লীগ পরে আওয়ামী লীগ নাম ধারন করে স্বৈর সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচী চালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু পাকিস্তানী স্বৈরশাসক পূর্ব পাকিস্তানীদের দাবীর প্রতি নমনীয় না হওয়ায় স্বাধীনতার দাবী মাথাচারা দিয়ে ওঠে। পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়।

---

[২৮]. শাহা, পরশ, বাংলাদেশের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি (এরশাদ পূর্ব), জোৎস্না পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৬৭, ৮৮, ৮৯।

[২৯]. হান্নান, ড. মোহাম্মদ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, ১৯৯০-১৯৯৯, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-২০০০, পৃষ্ঠা- ১২

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ যুগে রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ আমলে যারা রাজনীতিতে এগিয়ে এসেছিলেন তারা সবাই ছিলেন জমিদার, রাজণ্য, সামন্ত শ্রেণীর সন্তান। এরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তারা তাদের পূর্ব পুরুষের পেশা থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। তারা নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত হয়ে মধ্যবিত্ত পেশাজীবীদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। যে কারণেই ভারত পাকিস্তান বিভক্ত হোকনা কেন পাকিস্তান যুগেও দেখা যায় যে, ঐ ব্রিটিশ যুগের মত রাজণ্য, সামন্ত শ্রেণীর লোকেরা যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পেশাজীবী হিসাবে জীবন-যাপন করেছেন তারাই মূলত মধ্যবিত্ত পেশাজীবীদের নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন কর্মসূচী পরিচালনা করেছেন। এরা উচ্চ শ্রেণী থেকে এসে মধ্যবিত্তকে নিয়ে রাজনীতি করলেও উচ্চবিত্তের বেড়ি পেরিয়ে আসতে পারেননি। কিন্তু ব্রিটিশ যুগ থেকেই বাংলার নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রা লক্ষ্য করা যায়। কারণ ব্রিটিশ যুগেই দেখা গেছে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একটি কেন্দ্রমুখী অন্যটি প্রদেশমুখী। এই প্রদেশমুখী নেতৃত্বের ভেতর নতুন শ্রেণী থেকে আগত নেতাদের দেখা যায়। এদের কেউ কেউ অভিজাত পরিবার থেকে আসলেও অধিকাংশ নেতা গ্রামের ধনী কৃষক পরিবার থেকে শহরে এসে শিক্ষিত হয়ে আধুনিক পেশার সাথে সম্পৃক্ত শহুরে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা ব্যক্তিবর্গ। এদের নেতৃত্বের ধরনও ছিল ভিন্ন। এরা একেবারে সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীকে নিয়ে আন্দোলন করতেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যদিও পূর্ব বাংলা ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়, কিন্তু বেঙ্গল মুসলিম লীগের প্রদেশমুখী (ব্রিটিশ আমলে) নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় ছিলেন আপোষহীন। যে কারণে তাদের আন্দোলনের ইস্যু ছিল জাতীয়করণ, সমাজতান্ত্রিক আদলে গণতন্ত্রের রূপদান বা চর্চা, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সম-আচরণ ইত্যাদি অর্থাৎ এদের রাজনীতি ছিল মূলত সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ, দরিদ্র কৃষক-শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষদের নিয়ে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রথম রাজনৈতিক অধ্যায়েও এই ব্রিটিশ আমলের প্রদেশমুখী ধারার রাজনৈতিক Trend পুরোপুরি বজায় ছিল। তাই দেখা যায় স্বাধীনতার পরও প্রথম সরকার

Dhaka University Institutional Repository

তার প্রথম সংবিধানে গুরুত্বের সাথে এসব বিষয়কে তুলে ধরেন এবং সেভাবেই দেশ গঠনে প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন, যা চলে '৭৫ এর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। '৭৫ এর ১৫ আগস্টের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ অধ্যায়ে দেখা যায় প্রথম অধ্যায়ের বিপরীত দৃশ্য। জাতীয়করণ পলিসির পরিবর্তে বিরাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচী গৃহিত হয়। সরাসরি পুজিঁবাদী ব্যবস্থাকে উৎসাহিতকরণের পদ্ধতি হিসাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়। সবচেয়ে যে বড় দিক তা হল রাজনীতিতে নতুন শ্রেণীর আগমন। Elite শ্রেণী সরাসরি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে চলে আসছেন। অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, '৭৫ পরবর্তীতে সব সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ীরা সরাসরি রাজনীতিতে আসতে শুরু করে (যদিও '৭০-এর নির্বাচনে আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু ব্যবসায়ীকে প্রতিযোগীতা করতে দেখেছি)। তবে '৭৫ পরবর্তী ধারা ছিল একেবারে নতুন চিত্র।

১৯৮২ সালে আবার এই দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। সংবিধান স্থগিত হয়। তবে সে সরকারও রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে '৭৫ পরবর্তী রাজনৈতিক ধারা অনুসরণ করতে থাকে। এমনকি যে আওয়ামী লীগ সুদীর্ঘ রাজনৈতিক পথ পরিক্রমায় পেশাদার রাজনৈতিক ও মধ্যবিত্ত পেশাজীবীদের দ্বারা আবৃত ছিল, তারাও '৭৫ পরবর্তী রাজনৈতিক ধারাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেনি। তারাও প্রথম দিকে সমাজতন্ত্রের কথা, জাতীয়করণের কথা বলেও এরশাদ আমলে এসে সরাসরি পুঁজিবাদের কথা বলতে থাকে এবং আওয়ামী লীগও Elite শ্রেণী অর্থাৎ অবসরপ্রাপ্ত সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ীদের দলের নেতৃত্বে সুযোগ দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যদিও '৯০-এর গণঅভ্যুত্থান ছিল মূলত সরকার বিরোধী আন্দোলন, শাসন পদ্ধতির পরিবর্তন বিরোধী নয়। তাই '৯০-এর পরবর্তীতেও '৭৫ পরবর্তী রাজনীতির পুনরাবৃত্তি বা আরোও বেশি বিস্তৃত রূপ দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের রাজনীতিতে উদীয়মান নেতৃত্বের বিকাশ

উদীয়মান নেতৃত্ব বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ উপাখ্যান। উদীয়মান নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমাদের জানতে হবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কি এবং উদীয়মান নেতৃত্ব বলতে কি বুঝায়।

সাধারনতঃ যারা রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণের মাধ্যমে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন সময় দলের বিভিন্ন কর্মসূচীতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজস্ব প্রতিভার প্রতিফলন দ্বারা দলের ভিতর প্রাথমিক সদস্য থেকে ধীরে ধীরে দলীয় নেতৃত্বের পদ অলংকৃত করেন, দেশের ভিতর সংগঠিত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হয়ে আইন সভায় অংশগ্রহণ করেন অথবা বিজয়ী না হলেও নির্বাচনে প্রতিযোগীতা করার মত দলীয় সমর্থনের অধিকারী তাদেরকে রাজনৈতিক নেতা বলে গণ্য করা হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে যে, কিছু ব্যক্তিবর্গের দীর্ঘ রাজনৈতিক পথ পরিক্রমনের ইতিহাস না থাকা সত্ত্বেও তারা দলীয় সমর্থন নিয়ে দেশের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন এবং বিজয়ী হয়ে আইনসভার সদস্য হচ্ছেন। আর দল যদি সরকার গঠন করে, তবে সেই সরকারে তারা মন্ত্রী কিংবা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করছেন। আবার কখনও নির্বাচনে পরাজিত হলে দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে তারা অধিষ্ঠিত থেকেই যাচ্ছেন। এই হঠাৎ করে রাজনীতিতে আসা এবং দলীয় নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গকে উদীয়মান নেতা বলে। চলমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধারায় যখন কোন নতুন নেতৃত্বের অনুপ্রবেশ ঘটে তাকে উদীয়মান নেতৃত্ব বলে।

বাংলাদেশের উদীয়মান নেতৃত্বের বিকাশ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায়। বৃটিশ ভারতের Bengal Muslim League এর মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

দুটি ধারা বিদ্যমান ছিল– কেন্দ্রমুখী ও প্রদেশমুখী ।[১] এই প্রদেশমুখী ধারাতে দেখা গেছে যে, একটি পর্যায়ে (বৃটিশ শাসনের শেষ দিকে) নতুন শ্রেণী থেকে নেতা আসছেন; যা রাজনৈতিক দলগুলোর শুরুর দিকে ছিল না। আবার পাকিস্তান আমলে এসে বৃটিশ আমলের বেঙ্গল মুসলিম লীগের প্রদেশমুখী ধারা (পূর্ব বাংলায়) ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় এবং এর প্রসার ঘটে। পরবর্তীতে এরাই রাজনীতির মূল ধারায় পরিণত হয়। এই নতুন নেতৃত্বই পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশে পরিণত করতে মূল ভূমিকা রাখে। স্বাধীনতার পরও এই ধারার রাজনীতি অব্যাহত থাকে। কিন্তু '৭৫ এর ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। এই পর্যায়ে নতুন শ্রেণীর রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ ঘটে, যাদের কোন দীর্ঘ রাজনৈতিক পটভূমি নেই। রাজনীতির ময়দানে এরা একেবারেই নতুন। আমাদের আলোচনার প্রতিপাদ্য এরাই, কারণ '৭৫ পরবর্তীতে যেসব ব্যক্তিদের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল '৯০–এর গণ-অভ্যুত্থানের পরও তা পরিবর্তিত হয় নাই বরং বিস্তৃতি ঘটেছে।

আমাদের দেশে বর্তমানে দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল– আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'তে উদীয়মান নেতাদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাড়ছে এদের প্রভাব। এই বিষয়টি বিশ্লেষণের সময় আমরা যে প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন হতে পারি সেগুলো হলো–

১। কেন রাজনৈতিক দলগুলোতে উদীয়মান নেতাদের সংখ্যা বাড়ছে?

২। কেন এই সব ব্যক্তিরা রাজনীতিতে আগ্রহী হচ্ছেন?

৩। রাজনৈতিক দলগুলোই বা কেন এদের রাজনীতিতে সুযোগ করে দিচ্ছে?

৪। এদের প্রভাবে দলগুলোর কোন গুণগত পরিবর্তন হচ্ছে কিনা?

৫। উদীয়মান নেতাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি কি?

---

১. আলম, মো: বায়েজিদ ও হোসেন মো: দেলওয়ার, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিকাশের গতি প্রকৃতি ১৯৭২-২০০৫, দৈনিক সিলেটের ডাকা, ৮ জানুয়ারী, ২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর তখনই মিলবে যখন আমরা উদীয়মান নেতৃত্বের ধারাবাহিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করব।

৪.১ সাম্প্রতিক সময়ে (৯০' পরবর্তী) উদীয়মান নেতৃত্বের ইতিহাস ঃ

বর্তমান সময়ে উদীয়মান নেতৃত্বের পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গেলে স্বাধীনতার পটভূমি এবং স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা প্রয়োজন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভক্তি এবং স্বাধীন সর্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পশ্চাতে তিনটি প্রধান কারণ নির্ধারণ করা যায়।

১। বাংলাভাষা এবং এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধভিত্তিক যে বিশেষ সংস্কৃতি তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনে পাকিস্তান শাসকদের ব্যর্থতা।

২। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অসমতা দুরীকরণের মাধ্যমে পাকিস্তানকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে তৎকালীন সরকারগুলোর অসফলতা।

৩। সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব বাংলার জনগণকে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দানে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠির অস্বীকৃতি।[২]

মূলকথা হচ্ছে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য দুরীকরণ এবং পাকিস্তানকে একটি স্বনির্ভর কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার ব্যর্থতাই বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে আজকের স্বাধীন সর্বভৌম বাংলাদেশ।[৩]

---

২. Ahmed, Moudud, Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman, Dhaka, Upl, 1983-Page-29.
৩. হাসান মোহাম্মদ, বাংলাদেশঃ ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকা, গ্রন্থমেলা-২০০০, পৃষ্ঠা-১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসকে আমরা তিনটি পর্বে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করবঃ

৪.১(ক). প্রথম পর্ব ঃ

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পর্বটি ছিল মাত্র সাড়ে তিন বছরের, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যত বাংলার গতিমুখ নির্ধারিত হয় এই পর্বে, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয়েছে দেশ। মানুষের মনে বিরাট স্বপ্ন, শেখ মুজিবর রহমান ইতিহাসের মহানায়ক। তিনি শুধু মহানায়কই নন, তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের গণমানুষের গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মহা প্রকৌশলী।[৪] ১৯৭২ সালে সরকার প্রতিষ্ঠিত হল, রাষ্ট্রীয় মূলনীতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেল ধর্ম নিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ।

১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে ৭৩.১৪% ভোট পায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ।[৫] এই নির্বাচনের বিজয়ে আওয়ামী লীগের তথা শেখ মুজিবের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক গুণ বেড়ে যায়। সমাজতান্ত্রিক আদলে রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়াও শুরু করে সরকার, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল উঠতি ধনীক শ্রেণী। এরা মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি উচ্চারণ করত কিন্তু জাতীয়করণের নামে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির বেপরোয়া লুটপাটের মাধ্যমে প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয় করেছিলো।[৬] অপরদিকে যে প্রেক্ষাপটে দেশ স্বাধীন হয়েছিল তাতে সোভিয়েত, ভারত বলয়ের মধ্যে বাংলাদেশকে থাকতে হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও রক্ষী বাহিনীর অত্যাচার গণতন্ত্রের পথকে রুদ্ধ করেছিল। সর্বশেষ ১৯৭৫ সালে একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থা সংসদীয় গণতন্ত্রকে বিদায় করে দিল। এই ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পর্ব।

---

৪. সোবহান, রেহমান, বাংলাদেশ আত্মনির্ভর উন্নয়নের পথ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯০, পৃষ্ঠা-৪৫।

৫. সেন, অনুপম, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সমাজ, অবসর, ঢাকা-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১১৭ ।

৬. হক, আবুল ফজল, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা-২১।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫–এর ১৫ই আগস্ট সমাজতন্ত্রের মডেলের গণতন্ত্রের স্বপ্নের সমাপ্তি হয় এখানে।[৭]

৪.১(খ) দ্বিতীয় পর্ব ঃ

দ্বিতীয় পর্বের শুরু হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর থেকে এবং শেষ হয় ১৯৯০–এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে। এ সময়ের মধ্যে দুই বার সামরিক শাসন জারী হয়েছে। দুইজন প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা হয়েছে। ক্যু, পাল্টা ক্যুর প্রচেষ্টা হয়েছে একাধিক বার। পুরো সময়টা জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলেছে।[৮]

এরমধ্যে ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর সিপাহী জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন। তিনি যদিও অল্প সময়ের জন্য ক্ষমতাসীন ছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে জিয়াউর রহমানের শাসনকাল বিশেষভাবে স্মরণীয় এবং মহিমান্বিত।[৯]

জিয়াউর রহমান তার ক্ষমতা বেসামরিকীকরণের উদ্যোগ হিসাবে দল গঠনে মনোযোগী হন। ভাসানী ন্যাপ সেখানে যোগদান করে, বাম ও কমিউনিস্ট শিবিরের বিরাট অংশ আদর্শ ত্যাগ করে জিয়াউর রহমানের বিএনপি'তে যোগ দিয়ে জিয়াউর রহমানের জন্য সমর্থনের ভিত্তি (Support Base) তৈরী করে দেয়। জিয়াউর রহমানের সময়কাল থেকেই বিভিন্ন কমিউনিস্ট নামধারী গ্রুপগুলোর সশস্ত্র তৎপরতা স্তিমিত হতে থাকে, এ সঙ্গে দল ভাঙ্গা ও দল জোড়া লাগানোর প্রক্রিয়াও চলতে থাকে।[১০] অর্থাৎ তিনি সে সময়ের চলমান রাজনীতিতে সাড়া ফেলেন বা আরো পরিস্কারভাবে বলতে গেলে তার সময়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে

---

৭. Kapur, K. D., Soviet Strategy in south asia, New Delhi, 1983, Page-29.

৮. রনো, হায়দার আকবর খান, চার দশকের বাম রাজনীতি; একটি পর্যালোচনা, বাংলাদেশ রাজনীতি চার দশক (১ম খন্ড), শোভা প্রকাশ, ঢাকা-২০০৯, পৃষ্ঠা-১৫৯।

৯. মজিদ, শিরিন, শেখ মুজিব থেকে খালেদা জিয়া, ফাকলী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৪২।

১০. রেহমান, তারেক শামসুর, জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আর্দশ, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০, পৃষ্ঠা-২০৬-২১৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তনের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। জিয়াউর রহমান তিনটি বড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা করেন।

এক, ১৯৭৫—এর পট পরিবর্তনের পর বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শিবির পরিবর্তন করে। তখন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি আমাদের দেশে অনুপ্রবেশের সুযোগ পায়।

দুই, সংবিধান থেকে ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি বাতিল করেন এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দলগুলোকে বৈধতা দান করেন এবং তাদের সঙ্গে কিছুটা আপোস করেন।

তিন, সমাজতন্ত্রের স্লোগান বাদ দিয়ে তিনি পুঁজিবাদের পথ ধরেন।

উপরোক্ত তিনটি পরিবর্তন ছিল জিয়াউর রহমানের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। কারণ তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগের দিন পর্যন্ত তা ছিল বাংলাদেশের মানুষের কাছে কল্পানাতীত। জিয়াউর রহমানের আমলে এসে দেখা গেল মুজিব আমলে জাতীয়করণের নামে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনের মাধ্যমে যে উঠতি ধনিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল তারাই এসময়ে এসে বিরাষ্ট্রীয়করণের দাবী তুলল। জিয়াউর রহমানের আমলে বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রক্রিয়া শুরু হয়, যা এরশাদ আমলেও অব্যাহত থাকে। জিয়ার আমলে কৃষিতে ঘটানো হয় সবুজ বিপ্লব। উচ্চ ফলনশীল বীজ, সার, সেচের অধিক প্রয়োগ শুরু হয়। এতে কৃষিতে ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে। কৃষি উৎপাদন বেড়ে যায়। কিন্তু কৃষকদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়। জিয়ার আমল থেকেই আন্তর্জাতিক পুঁজি ঋণ ও সাহায্য আকারে আসতে শুরু করে।[১১]

জিয়াউর রহমানের আমলে যেসব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল পরবর্তী কোন সরকারের পক্ষে তা পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি, বরং পরিবর্ধিত হয়েছে। জিয়ার আমল থেকে শুরু হওয়া

---

[১১] রেহমান, তায়েফ শামসুর, জিয়াউর রহমানের বৈদেশিক নীতি মৌলী প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০,পৃষ্ঠা-৯৫-৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক ঋণ এরশাদ আমলে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই ঋণের একটা বড় অংশ দিয়ে শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ধনিক শ্রেণী তাদের সম্পদের স্ফিতি ঘটায়। দেশবাসীকে তাই জাতীয় আয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ডেভিড সার্ভিস হিসাবে দিতে হচ্ছে। বিদেশী ঋণের দ্বারা আমরা উপকৃত হইনি, কোন আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি বা শিল্প ভিত্তি গড়ে উঠেনি। যা হয়েছে তা হলো ধনী শ্রেণীর সম্পদ বৃদ্ধি, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি এবং আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদের অধিকতর হস্তক্ষেপ। এই প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত রয়েছে। এরশাদ আমলে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় Structural Adjustment Programme– বাণিজ্য উদারীকরণ, প্রাইভেটাইজেশন ও কৃষিতে ভর্তুকি বন্ধ বা হ্রাস হচ্ছে যার মূল কথা। '৯০–এর দশকে বিশ্বায়নের নামে এই প্রক্রিয়া আরও তীব্র হয়।[১২]

এরশাদ আমলের সবচেয়ে বড় দিক হল এরশাদ সরকারের নয় বছরের শাসন ব্যবস্থা কিন্তু তেমনভাবে জনগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়নি। যদিও তিনি জিয়াকে অনুসরণ করে তার সরকারকে বেসামরিকীকরণের জন্য দল গঠন করেন। তার পরও এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হতে থাকে। এরশাদের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের বড় দিক হল এই যে, এই আন্দোলনে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, নারী, সংস্কৃতিকর্মী ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার স্বতন্ত্র স্বাধীন মঞ্চ গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেকেই তার নিজ অবস্থান থেকে সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়। আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের আদর্শগত পার্থক্য ভুলে গিয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলনে একযোগে কাজ করে যেতে থাকে। অবশেষে '৯০–এর ডিসেম্বরে এরশাদের পতন হয়।[১৩] শুরু হয় নবযুগের এবং শেষ হয় স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের দ্বিতীয় পর্বের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে আমরা অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীলতার বর্ণনা করেছি। কারণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের গবেষণার বিষয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশমান ধারায় বর্তমান সময়ের উদীয়মান

---

১২. Dilara Chowdhury, Bangladesh and the south Asian International System, Scorpion Publication Limited, London , 1992, Page-192.

১৩. আহমদ, সরকার সাহাবুদ্দিন, আত্মঘাতি রাজনীতির তিন কাল, যুক্তস্ ফেয়ার, ঢাকা, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা-২০০৪, পৃষ্ঠা-২৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক পটভূমি। এ কারণে উক্ত বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশের দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখেছি যে, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসেই প্রচলিত অর্থনীতি ও রাজনীতিতে সমভাবে পরিবর্তন আনেন। তিনি একদিকে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন ঘটিয়ে বিশ্ব অর্থনীতির আধুনিক চলমান ধারায় দেশের অর্থনীতির উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হন। এক্ষেত্রে তিনি একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক। কারণ তার প্রবর্তিত ধারার পরিবর্তন করা পরবর্তী কোন সরকারের পক্ষে এমনকি কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে সম্ভব হয়নি।[১৪] তাই দেখা যায় যে, '৭৫ পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ কিছুদিন মিশ্র অর্থনীতির কথা বললেও এরশাদের আমলে এসে দলীয় ঘোষণাপত্রে পুরোপুরি ধনতন্ত্রের পথ অনুসরণের কথা বলছে।

১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মেনুফেস্টোতে '৭৫ পূর্ববর্তী আদর্শবাদ ছিল না, ছিল প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে মিশে ক্ষমতা কেন্দ্রীক রাজনীতির প্রতি ঝোঁক।[১৫] আবার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যখন তার সরকারকে বেসামরিকীকরণ করে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রচলন ঘটানোর জন্য দল গঠনের উদ্যোগ নেন, তখন তার দলে পেশাদার রাজনৈতিক (ভাসানী-ন্যাপ, কমিউনিস্টদের কিছু অংশ) যেমন ছিল তেমনি মুসলিম লীগের কিছু প্রবীন ব্যক্তিও ছিল। রাজনীতিবিদদের সাথে তিনি বিভিন্ন পর্যায়ের এলিটদের নিয়ে দল গঠন করেন। এই এলিট শ্রেণীর মধ্যে ছিল অবঃ সামরিক বেসামরিক আমলা, উচ্চ বিত্ত ব্যবসায়ী (শিল্পপতি, আমদানীকারক, রপ্তানীকারক)। এই এলিট শ্রেণীর রাজনীতিতে আবির্ভাব ছিল আকস্মিক।[১৬] পরবর্তীতে দেখা যায় যে, বিএনপি'র অনুকরণে দেশের গুরুত্বপূর্ণ দলগুলো এলিট শ্রেণীকে দলের নেতৃত্বের সুযোগ দিচ্ছে। এ ব্যবস্থার পরিবর্তন কোন সরকার বা কোন রাজনৈতিক দল ঘটাতে পারেনি বরং আরো পরিপূর্ণতা দিয়েছে।

---

[১৪]. ভুইয়া, ওয়াদুদ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা-২০০৪, পৃষ্ঠা-১২১।

[১৫]. Hasunuzzaman, Al Masud. Role of Opposition in Bangladesh Politics, Upl, Dhaka, 1998.

[১৬] কাদের, আহমেদ আবদুল, বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও ধর্ম নিরপেক্ষতা, বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিঃ, ঢাকা ২০০৮, পৃষ্ঠা- ২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১(গ) তৃতীয় পর্ব ঃ

স্বাধীনতাত্তোর তৃতীয় পর্ব শুরু হয় নব্বই–এর গণঅভ্যুত্থান থেকে। '৯০–এর গণঅভ্যুত্থানের পর একটা বিশেষ বিষয় লক্ষণীয় যে, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মত অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক দল (যেমন-সিপিবি, ওয়ার্কার্স পার্টি, জামায়েতে ইসলাম, জাসদ ইত্যাদি) এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল। সর্বোপরি দেশের আপামর জনসাধারণের আন্দোলনের ফল ছিল '৯০–এর গণঅভ্যুত্থান। কিন্তু দেশের জনগণ যেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এ দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করল।[১৭] ফলে অন্যান্য রাজনৈতিক দল অনেকটা জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। এসব দলগুলো এই দুটি বৃহৎ জনগুরুত্বপূর্ণ দলের সঙ্গে আপোষ করে পথ চলেছে, যা গবেষণা পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে। '৯০ পরবর্তী রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধারায় উভয় দলই '৭৫ পরবর্তী ধারা অনুসরণ করতে থাকে। তবে এখানে এসে আমরা দেখতে পাই এলিট শ্রেণীর উদীয়মান নেতাদের সংখ্যা যেমন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে সঙ্গে পেশাগত রাজনীতিকদের সংখ্যা কমছে। ছাত্র রাজনীতিতেও একটা বড় পরিবর্তন '৯০ পরবর্তীতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কারণ, আগে (বৃটিশ, পাকিস্তান এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে) ছাত্র নেতা থেকে বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতা হয়ে ধীরে ধীরে দলের মূল ধারার নেতা হতে হত এবং তারা পেশাদার রাজনৈতিক হিসাবে দলকে, দেশকে সেবা দিয়ে যেত।[১৮] কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে একসময়ের ছাত্র নেতা সুযোগ পেয়ে সরকারী চাকুরিতে থেকে আমলা হয়ে অবসরের পর দলে এসে দলের মূল ধারার নেতা হয়ে যাচ্ছেন। একইভাবে কেউবা ছাত্র অবস্থায় হঠাৎ কোন ভাল কাজ দ্বারা দলীয় সফলতা আনায় সুবাদে সরাসরি দলের মূল ধারার নেতা হয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে পেশাদার নেতা হওয়ার প্রবণতা লোপ পাচ্ছে। কারণ এইসব ছাত্র নেতারা পেশা হিসাবে ব্যবসা বা অন্যান্য কিছুকে গ্রহণ করছেন। ফলে পেশাদার রাজনীতিকের সংখ্যা কমছে। এ অবস্থা '৯০ পরবর্তীতে শুরু হয়ে বর্তমানেও দুই দলে বিদ্যমান রয়েছে, যা আমরা গবেষণায় দেখতে পেয়েছি। ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের

---

[১৭]. Ahamed, Nizam, The Parlament of Bangladesh, Alsgate, U.K.2002, Page-203.

[১৮]. কায়েসাব, আশরাফ, বাংলাদেশ রাজনৈতিক হত্যাকান্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

পরে ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত যে সংসদ নির্বাচন হয়েছে তার ফলাফল সংক্ষেপে নিম্নরুপ ঃ[১৯]

১৯৯১ সালের পঞ্চম সংসদ নির্বাচন

ক্ষমতাসীন দল বিএনপি-প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ

(যদিও কিছু ক্ষুদ্র দল এসব দলের সঙ্গে ক্ষমতার ভাগাভাগিতে একাত্ম হয়েছে)

১৯৯৬ সালে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ – প্রধান বিরোধীদল বিএনপি

২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ক্ষমতাসীন দল বিএনপি (যদিও বিএনপি চার দলীয় জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করেছিল, কিন্তু ক্ষমতায় কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিএনপি ।)	**প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ** (অন্যকিছু দল বিরোধী শিবিরে থাকলেও তাদের অবস্থান ছিল খুবই দূর্বল)

২০০৮ সালে ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ যদিও চৌদ্দ দলকে সাথে নিয়ে মহাজোট গঠন করে নির্বাচন করেছে, কিন্তু মূল ক্ষমতায় রয়েছে আওয়ামী লীগ ।	**প্রধান বিরোধীদল বিএনপি** অন্য কিছু ক্ষুদ্র দল বিরোধী অংশে থাকলেও তাদের প্রভাব ছিল সীমিত ।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষমতার হাত বদল আওয়ামী লীগ ও

[১৯]. নির্বাচন কমিশন থেকে সংগৃহীত-২০০৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি'র মধ্যেই কেন্দ্রীভূত। দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক অবস্থা বর্তমানে বাংলাদেশে প্রভাবশালী। কারণ অন্যান্য দল থাকলেও তারা এককভাবে বা জোটবদ্ধ হয়েও এই দুই দলকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে রেখে ক্ষমতায় যাওয়ার মত সাংগঠনিক শক্তি এখনও অর্জন করতে পারেনি।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের প্রধান দুই দলে উদীয়মান নেতাদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়ছে সংসদ নির্বাচনগুলোতে। ৫ম সংসদ থেকে ৯ম সংসদ পর্যন্ত উভয় দলের সংসদ সদস্যদের উপর জরিপ চালিয়ে যে চিত্র পাওয়া যায় তা নিম্নরুপ।[২০]

সারণী ৪.১

৫ম সংসদ থেকে ৯ম সংসদ পর্যন্ত সংসদ সদস্যদের পেশাগত অবস্থান

৫ম সংসদ	ব্যবসায়ী নেতা	৩৮.৬৭%
	পেশাজীবী নেতা	১২.০০%
	আইনজীবী নেতা	১৯.০০%
	সার্বক্ষণিক রাজনীতিবিদ	১৭.০০%
	অবঃ সামরিক আমলা নেতা	৪.০০%
	অবঃ বেসামরিক আমলা নেতা	২.৩৩%

৭ম সংসদ	ব্যবসায়ী নেতা	৪৩.৬৭%
	পেশাজীবী নেতা	১৪.০০%
	আইনজীবী নেতা	১৬.৬৭%
	সার্বক্ষণিক রাজনীতিবিদ নেতা	৮.৬৬%
	আবঃ সামরিক আমলা নেতা	৫.৩৩%
	অবঃ বেসামরিক আমলা	১.৩৩%

২০. রেহমান, তারেক শামসুর, জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচন : ১৯৭৩, বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, প্রথম খন্ড, শোভা প্রকাশ, ঢাকা-২০০৯, পৃষ্ঠা-১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

৮ম সংসদ	ব্যবসায়ী নেতা	৫৬.৬৭%
	পেশাজীবী নেতা	১০.৬৭%
	আইনজীবী নেতা	১১.০০%
	সার্বক্ষণিক রাজনীতিবিদ নেতা	৮.৬৬%
	আবঃ সামরিক আমলা নেতা	৫.০০%
	অবঃ বেসামরিক আমলা	৩.০০%

৯ম জাতীয় সংসদ	ব্যবসায়ী নেতা	৫৮.৮%
	পেশাজীবী নেতা	৫.০০%
	আইনজীবী নেতা	১১.৫%
	সার্বক্ষণিক রাজনীতিবিদ নেতা	৭.০০%
	আবঃ সামরিক আমলা নেতা	৮.৩৫%
	অবঃ বেসামরিক আমলা	৪.২০%

৪.২ ফলাফল বিশ্লেষণ ঃ

উপরোক্ত জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, ধীরে ধীরে নেতৃত্বে ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক আমলা নেতাদের সংখ্যা। আইনজীবী নেতাদের অবস্থা মোটামুটি স্থিতিশীল বলা যায়। কিন্তু অন্যান্য পেশাজীবী নেতাদের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। তবে সার্বক্ষণিক রাজনীতিবিদদের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। এর কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, স্বাধীনতার পর অর্থাৎ ১৯৭২-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত দেশের রাজনীতি ছিল মূলতঃ মধ্যবিত্ত পেশাজীবী শ্রেণী ও সার্বক্ষণিক রাজনীতিবিদদের দ্বারা পরিচালিত। '৭৫ পরবর্তী রাজনীতির Trend ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। এ সময় এসে দেখা যায় যে, নব্য বিকশিত ধনিক শ্রেণী আরো বেশী করে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। অপরদিকে ক্ষমতাকে জোরালো করতে এবং শাসন ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের দলীয় পদ ও সরকারী দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করেন। এই দুই নতুন গোষ্ঠীর অভিষেকে দলগুলো আগের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে পড়ে। কারণ উচ্চবিত্ত ও উচ্চবুদ্ধি

Dhaka University Institutional Repository

দুই-ই দল পরিচালনায় প্রয়োজন। তাই এদের দলীয় অভ্যর্থনাও বাড়তে থাকে।[২১] অপরদিকে '৯০ সালে এসে যে গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল তা ছিল মূলত এরশাদ সরকার বিরোধী, পুঁজিবাদ বিরোধী নয় বা '৭৫ পরবর্তীতে যে উদীয়মানদের অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছিল তা রোধ করার জন্যও নয়। আরো দেখা যায় যে, '৯০ পরবর্তীতে ছাত্র রাজনীতির ধরণও বদলে যায়। ছাত্র নেতা থেকে দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা হয়ে ধীরে ধীরে দলের কেন্দ্রীয় নেতা হওয়ার প্রবণতা কমে আসে। বরং ছাত্র নেতা থেকে সরাসরি দলের কেন্দ্রীয় নেতা হবার সুযোগ বেড়ে যায়। '৯০–এর গণঅভ্যুত্থানে যে সব ছাত্র নেতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল তারা দ্রুতই মূল দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হয়ে গেছেন এবং দলের মনোনয়ন নিয়ে সংসদ সদস্য হবারও সুযোগ পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, তারা পেশা হিসাবে শুধু রাজনীতিকে গ্রহণ করছেন না; তাদের অধিকাংশই ব্যবসাসহ অন্যান্য পেশার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। তাই আমরা উদীয়মান নেতা হিসাবে দুটি এলিট গোষ্ঠীকে দেখতে পাই– ব্যবসায়ী এবং অবঃ সরকারী আমলা (সামরিক ও বেসামরিক)।

এ কারণে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণকে গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে পরবর্তী অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছি, যা বর্তমান সময়ের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ উদীয়মান নেতারাই এক সময় দলের মূলধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকেন। বাংলাদেশের নেতৃত্বের ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণে একথা যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়।

---

২১. আহমদ, সা'দ, আমার দেখা রাজনীতির তিনকাল, খোসরাজ, কিতাবমহল, ঢাকা- ২০০৬, পৃষ্ঠা- ২৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সাম্প্রতিককালে (বিগত শতকের '৯০ দশকের পরবর্তী সময়কাল) আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক পটভূমি ঃ তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে ব্যাখা-বিশ্লেষণ

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের ক্ষমতার পালা বদল হয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-এ দুটি দলের মধ্যে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় বর্তমান সময়ে উপরোক্ত দল দুটি ছাড়াও অন্যান্য দলের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে তারা ক্ষমতায় যাওয়ার মতো সক্ষমতা এখনো অর্জন করতে পারেনি। আর এ কারণে সমাজের উদীয়মান প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র প্রতি আগ্রহ বেশী।

৫.১ উদীয়মান নেতাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণ ঃ

উদীয়মান নেতাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণে মাঠ পর্যায়ে যেসব উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে, তাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে উদীয়মান নেতৃত্বের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান ব্যাখা করতে সচেষ্ট হয়েছি। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছেঃ

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা
২. পেশা
৩. বাৎসরিক আয়
৪. স্থায়ী বাসস্থান
৫. বয়স

৫.২ শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর জরিপ করতে গিয়ে উভয় দলের ১০০ জন করে উদীয়মান নেতার শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য সংগ্রহ করে নিম্নোক্ত সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৫.১

উদীয়মান নেতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার শতকরা হার

দলের নাম	এস,এস,সি পর্যায়ের নীচে	এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর
আওয়ামী লীগ	৩%	১৫%	৩০%	৫২%
বিএনপি	২%	১২%	৪৩%	৪৩%

উপরোক্ত সারণী অনুসারে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিশ্লেষণ অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে দল ভিত্তিক বিশ্লেষণ করাকে সুবিধাজনক বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

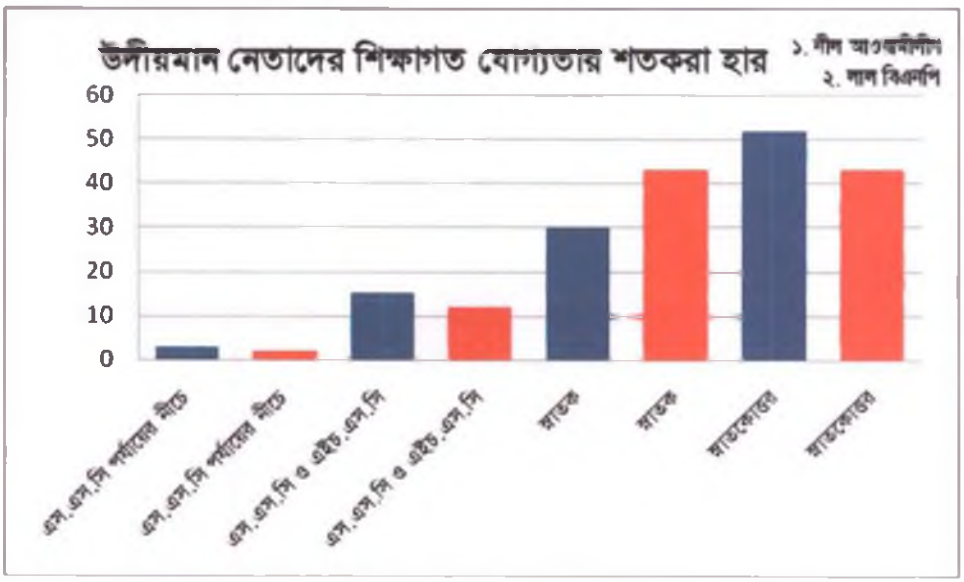

৫.২.১আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের শিক্ষাগত অবস্থান ঃ

আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১০০ জন নেতার মধ্যে মাত্র ৩ জন নেতা এস,এস,সি পর্যায়ের নীচে। অর্থাৎ স্ব-শিক্ষিত নেতার অবস্থান খুবই সীমিত। একইভাবে, এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি পর্যায়ের নেতার শতকরা হার ১৫ (১০০ জন উদীয়মান নেতার মধ্যে ১৫ জন)। অর্থাৎ মধ্যম মানের শিক্ষিত নেতার সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কম। অপরদিকে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন নেতার শতকরা হার

Dhaka University Institutional Repository

৩০ এবং স্নাতকোত্তর নেতার শতকরা হার ৫২। এখানে এ কথা স্পষ্ট প্রমাণিত যে, উচ্চ শিক্ষিত নেতাদের অবস্থান দলের ভিতর খুবই শক্তিশালী।

উপরোক্ত উদীয়মান নেতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, স্ব-শিক্ষিত (এস,এস,সি পর্যায়ের নীচে) এবং স্বল্প শিক্ষিত (এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি, পাস) উদীয়মান নেতা আওয়ামী লীগে কম আসছেন বা কম সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু উচ্চ শিক্ষিত (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) নেতাদের উপস্থিতি খুবই বেশি। দেখা যায় যে, ১০০ জন উদীয়মান নেতার মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত নেতার সংখ্যা (স্নাতক ৩০, স্নাতকোত্তর ৫২) ৮২ জন। যেখানে ১০০ জন নেতার মধ্যে ৮২ জন উচ্চ শিক্ষিত সেখানে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতৃত্ব উচ্চশিক্ষিত। আবার এই উচ্চ শিক্ষিত নেতাদের মধ্যে দেখা যায় যে, স্নাতক ডিগ্রীধারীদের তুলনায় স্নাতকোত্তর নেতাদের সংখ্যা বেশি। এর কারণ অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, উদীয়মান নেতাদের বড় অংশ পেশাজীবী শ্রেণী (আইনজীবী, আমলা, শিক্ষক, ডাক্তার) থেকে এসেছেন।

৫.২.২ বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের শিক্ষাগত অবস্থান ঃ

বিএনপি'তে এস,এস,সি পর্যায়ের নিচের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন উদীয়মান নেতাদের সংখ্যা ১০০ জনে মাত্র ২ জন। অর্থাৎ স্ব-শিক্ষিত উদীয়মান নেতাদের উপস্থিতি বিএনপি'তে বর্তমানে খুবই সীমিত। অনুরূপভাবে এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি পাশ নেতাদের শতকরা হার ১২ (১০০ জন উদীয়মান নেতার মধ্যে ১২ জন)। অর্থাৎ মধ্যম মানের শিক্ষিত নেতা বা স্বল্প শিক্ষিত নেতাদের সংখ্যা বিএনপি'তেও কম। অপরদিকে উচ্চ শিক্ষিত উদীয়মান নেতাদের অবস্থান দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কারণ, ১০০ জন উদীয়মান নেতার মধ্যে ৪৩ জন স্নাতক এবং ৪৩ জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিএনপি'তে উচ্চ শিক্ষিত নেতার মোট সংখ্যা শতকরা ৮৬ জন। এ থেকে সহজেই বোধগম্য যে, বিএনপি'তে স্ব-শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত উদীয়মান নেতার সংখ্যা খুবই কম। পক্ষান্তরে, উচ্চ শিক্ষিত উদীয়মান নেতাদের সংখ্যা বেশি এবং দলের মধ্যেও তারা প্রভাবশালী।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.৩ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতৃত্বের শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ ঃ

স্ব-শিক্ষিত (এস,এস,সি পর্যায়ের নীচে) এবং স্বল্প শিক্ষিত (এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি) নেতাদের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যে সামান্য তারতম্য পরিলক্ষিত হয়েছে। স্ব-শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত নেতার সংখ্যা বিএনপি'তে আওয়ামী লীগের তুলনায় কিছুটা কম। কারণ হিসাবে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ পুরানো ঐতিহ্যবাহী দল হওয়ায় এবং শুরু থেকেই উঠতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়ে সংগঠিত ছিল বিধায় আওয়ামী লীগের প্রতি স্ব-শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত শ্রেণী কিছুটা বেশি আস্থাশীল। অপরদিকে বিএনপি'র বিকাশ ঘটেছিল শহর কেন্দ্রীক উচ্চবিত্ত, উচ্চ শিক্ষিত এলিট শ্রেণী থেকে। আর সে কারণে স্ব-শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ শুরু থেকেই কম ছিল। সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, আওয়ামী লীগে এস.এস.সি-এর নীচে শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন নেতা শতকরা ৩ জন, বিএনপি'তে এস.এস.সি-এর নীচে শতকরা ২ জন। অনুরূপভাবে এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি পর্যায়ের নেতাদের সংখ্যা আওয়ামী লীগে ১৫% আর বিএনপি'তে ১২%।

উচ্চ শিক্ষিত নেতাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগে শতকরা ৩০ জন স্নাতক এবং শতকরা ৫২ জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী। পর্যবেক্ষণ থেকে স্পষ্ঠ যে, আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে বর্তমানে উচ্চ শিক্ষিত উদীয়মান নেতার সংখ্যা বেড়েছে এবং এদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত পেশাদার (চাকুরীজীবী) নেতার সংখ্যাই বেশী। কিন্তু বিএনপি'তে উচ্চ শিক্ষিত নেতাদের আধিপত্য থাকলেও তাদের শতকরা হার (স্নাতক ৪৩% স্নাতকোত্তর ৪৩%) ৮৬ জন। উচ্চ শিক্ষিত উদীয়মান নেতাদের দলের ভিতর সংখ্যাধিক্য প্রমাণ করে যে, বিএনপি যে উচ্চ বিত্ত ও উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণীকে নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছিল তা এখনও বর্তমান আছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, আওয়ামী লীগের উচ্চ শিক্ষিত নেতাদের শতকরা হার ৮২ জন এবং বিএনপি'তে ৮৬ জন। অর্থাৎ বিএনপি'র উচ্চ শিক্ষিত নেতার হার আওয়ামী লীগের তুলনায় কিছুটা বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় যে, উদীয়মান নেতাদের মধ্যে যারা স্ব-শিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত তাদের আগ্রহ যেমন বিএনপি'র তুলনায় আওয়ামী লীগের প্রতি কিছুটা বেশী, ঠিক একইভাবে উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণীর উদীয়মান নেতাদের আওয়ামী লীগের তুলনায় বিএনপি'র প্রতি আগ্রহ বেশী। বাংলাদেশের বৃহৎ জন গুরুত্বপূর্ণ দল– আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের শিক্ষাগত অবস্থানের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য থাকলেও একটি বিশেষ জায়গায় উভয় দলের অবস্থানের যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তা হচ্ছে স্ব-শিক্ষিত (এস,এস,সি এর নীচে) নেতাদের সংখ্যা উভয় দলে খুবই সীমিত। স্বল্প-শিক্ষিত (এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি পর্যায়ের) উদীয়মান নেতাদের সংখ্যা বিএনপি'র তুলনায় আওয়ামী লীগে কিছুটা বেশী। উচ্চ শিক্ষিত (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) নেতার সংখ্যা উভয় দলে বেশী। তবে সংখ্যাগত দিক দিয়ে এ ক্ষেত্রে বিএনপি আওয়ামী লীগের তুলনায় একটু উপরে। লক্ষণীয় যে, দেশে শিক্ষিতের হার যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যাও বাড়ছে। আজ রাজনীতিতে যারা আসছেন তারা শিক্ষার উচ্চ স্তর থেকে আসছেন।

যেহেতু উদীয়মান নেতাদের সিংহ ভাগই উচ্চ শিক্ষিত, সেহেতু তারা সচেতন হবেন এটা স্বাভাবিক। রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় তাঁরা শিক্ষার ছাপ রাখবেন, পারদর্শিতার পরিচয় দেবেন এটাই মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এরূপ প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটছে না।

৫.৩ পেশা ঃ

যদিও বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর দেশ, তারপরও এখানে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। এছাড়া ব্যাংক, বীমা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, বহুজাতিক কোম্পানীসহ সরকারী-বেসরকারী বহুবিধ পেশার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এদেশের রাজনীতিতে পেশাজীবীদের নেতৃত্বদান করার প্রবণতা অনেক আগে থেকে লক্ষ্য করা গেলেও বর্তমান সময়ে কোন কোন পেশার মানুষ রাজনৈতিক নেতৃত্বকে কতটুকু প্রভাবিত করছে তা যথাযোগ্য প্রমান সাপেক্ষে বিশ্লেষণ অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাই আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের মধ্যে থেকে ১০০ জন করে, মোট ২০০ জনকে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা গেছে

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রতিক সময়ে পেশার ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্নতা এসেছে পেশাজীবীদের সংখ্যাও নেতৃত্বের পর্যায়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনীতিতেও তাদের প্রভাব বেড়েছে। এ পর্যায়ে নেতাদের পেশাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তাদের উপর জরিপ চালিয়েছি। জরিপের ফলাফল নিম্ন সারণীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো।

সারণী ৫.২

উদীয়মান নেতাদের পেশার শতকরা হার

দলের নাম	কৃষিজীবী	ব্যবসায়ী	বেসরকারী চাকুরীজীবী	আইনজীবী	(অবঃ) সরকারী আমলা	চিকিৎসক	শিক্ষক	অন্যান্য
আওয়ামী লীগ	৫%	৪৪%	৫%	১২%	১৭%	৮%	৪%	৫%
বিএনপি	১০%	৫৫%	৫%	১১%	৯%	২%	৪%	৪%

উপরোক্ত সারণী থেকে দেখা যায় যে, বেসরকারী চাকুরীজীবী ও শিক্ষকের সংখ্যা উভয় দলেই সমান। আইনজীবী, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলা ও চিকিৎসকের সংখ্যা বিএনপি'র তুলনায় আওয়ামী লীগে বেশী। পক্ষান্তরে কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ীর সংখ্যা আওয়ামী লীগের তুলনায় বিএনপি'তে বেশি।

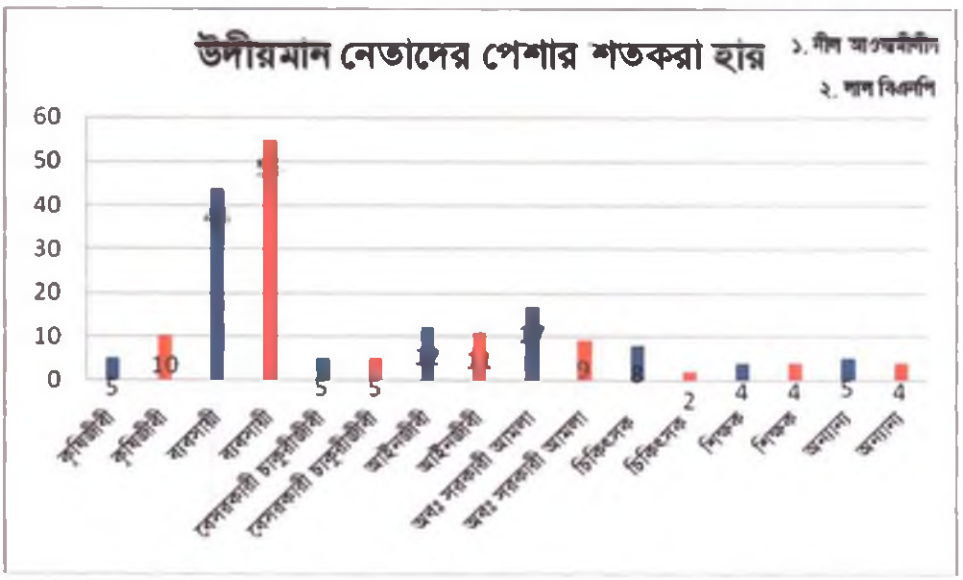

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.১ আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের পেশা সংক্রান্ত জরিপ বিশ্লেষণঃ

আওয়ামী লীগের উৎপত্তি হয়েছিল উদীয়মান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পেশাজীবী শ্রেণী থেকে। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর আশা আকাঙ্খা বাস্তবায়নই তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের মধ্যে ৪৪ জনের পেশা ব্যবসা। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক আমলার শতকরা হার ১৭। অপরদিকে মধ্যবিত্ত পেশাজীবীদের সংখ্যা ক্রমেই কমছে। উদীয়মান নেতাদের মধ্যে মাত্র ১২ জন আইনজীবী, ৮ জন চিকিৎসক, ৪ জন শিক্ষক; বেসরকারী চাকুরীজীবী ৫ জন এবং কৃষিজীবী ৫ জন। বিবিধ পেশার আছেন ৫ জন (বিবিধ পেশার মধ্যে আছে ছাত্র, গৃহিনী, সাংবাদিকসহ অন্যান্য)। মধ্যবিত্ত পেশাজীবীদের মোট হার হচ্ছে ৩৯% (আইনজীবী ১২%, চিকিৎসক ৮%, বেসরকারী চাকুরীজীবী ৫%, কৃষিজীবী ৫%, শিক্ষক ৪%, বিবিধ ৫%)। উচ্চবিত্ত উদীয়মান নেতাদের মোট শতকরা হার ৬১% (ব্যবসায়ী ৪৪%, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলা ১৭%)।

উপরোক্ত মধ্যবিত্ত উদীয়মান নেতাদের সমষ্টিগত অবস্থান (৩৪%) ও উচ্চবিত্ত উদীয়মান নেতাদের সমষ্টিগত (৬১%) অবস্থান থেকে সহজেই অনুমেয় যে আওয়ামী লীগে উচ্চবিত্ত উদীয়মান নেতাদের সংখ্যা ও প্রভাব দুই-ই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তথ্য পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, মধ্যবিত্ত পেশাজীবীদের মধ্যেও অনেকেই দ্বিতীয় পেশা হিসাবে ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। যেমন- ১২% আইনজীবীর মধ্যে ৩% ব্যবসা করেন। কৃষিজীবী ৫% এর মধ্যে ৪% ব্যবসা করেন। বেসরকারী চাকুরীজীবী ৫% এর মধ্যে ৩% ব্যবসা করেন। শিক্ষক ৪% এর মধ্যে ১% এর ব্যবসা আছে। বিবিধ পেশার উদীয়মান নেতাদের মধ্যে ২% সাংবাদিক আছেন। এই ২% এর ভিতর ১%-এর সাংবাদিকতার পাশাপাশি দ্বিতীয় পেশা হিসাবে ব্যবসা রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, '৭৫ পূর্ববর্তী রাজনীতিতে আওয়ামী লীগে সাংবাদিকদের অবস্থান পেশাজীবীদের মধ্যে অনেক বেশি ছিল। কিন্তু '৭৫ পরবর্তী রাজনীতিতে সাংবাদিকদের সংখ্যা কমে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, উদীয়মান মধ্যবিত্ত পেশাজীবী নেতাদের (৩৯%) মধ্যে শতকরা (আইনজীবী ৩ জন, কৃষিজীবী ৪ জন, বেসরকারী চাকুরীজীবী ৩ জন, শিক্ষক ১ জন, সাংবাদিক ১ জন) ১২ জন দ্বিতীয় পেশা হিসাবে ব্যবসা করেন। এই ১২ জন পরোক্ষভাবে ব্যবসায়ী। সুতরাং গবেষণায় দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগের উচ্চবিত্ত উদীয়মান নেতার মোট হার (প্রত্যক্ষ ব্যবসায়ী ৪৪%, পরোক্ষ ব্যবসায়ী ১২%, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলা ১৭%) ৭৩%। অর্থাৎ প্রায় ৩/৪ অংশ উদীয়মান নেতা উচ্চবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। যেখানে ১০০ জন উদীয়মান নেতার মধ্যে ৭৩ জনই উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত, সেখানে এই নেতারা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের প্রতিনিধিত্ব করবেন এটা প্রায় অসম্ভব। অতএব জরিপের ফলাফল মূল্যায়নে বলা যায় যে, বর্তমান সময়ের আওয়ামী লীগ উচ্চবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী গণতান্ত্রিক দল। এখানে মধ্যবিত্তের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়না, তবে উচ্চবিত্ত শ্রেণী বেশি গুরুত্ব পায়।

৫.৩.২ বিএপি'র উদীয়মান নেতাদের পেশা সংক্রান্ত জরিপ বিশ্লেষণ ঃ

বিএনপি গঠিত হয়েছিল শহুরে উচ্চ মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিয়ে। একারণে শুরু থেকেই বিএনপি'তে উচ্চবিত্ত নেতার সংখ্যা ও প্রভাব বেশী। এ দলে মধ্যবিত্ত নেতারা এসেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। তবে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর নেতাদের প্রভাবকে কখনও ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে উচ্চবিত্তের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বিএনপি'র মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে তাতে বিএনপি'র ভূমিকা অগ্রগণ্য। বিএনপি'র আবির্ভাবের সাথে সাথে যে ধনতান্ত্রিক ধারার বিকাশ ঘটেছিল ধীরে ধীরে তার বিস্তার ঘটেছে। জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক ধনতান্ত্রিক নীতি গৃহীত হয়েছে। এর প্রকৃষ্ট প্রমান হল, আওয়ামী লীগের ১০০ জন উদীয়মান নেতার মধ্যে ৭৩ জনই উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছেন।

বিএনপি'র ১০০ জন উদীয়মান নেতার উপর জরিপ চালিয়ে দেখা যায় যে, ৫৫% ব্যবসায়ী, ৯% অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলা, ১১% আইনজীবী, ২% চিকিৎসক, ৪% শিক্ষক, ১০% কৃষিজীবী, ৫% বেসরকারী চাকুরীজীবী, ৪% বিবিধ (গৃহিনী, পেশাদার রাজনীতিক, প্রাক্তন ছাত্র নেতা)। মধ্যবিত্ত পেশাজীবী

Dhaka University Institutional Repository

৩৬% নেতার মধ্যে আবার অনেকেই দ্বিতীয় পেশা বা একাধিক পেশা হিসাবে ব্যবসার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। গবেষণায় যখন মধ্যবিত্ত পেশাজীবী ৩৬ জন নেতার ব্যক্তিগত তথ্য পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, তখন দেখা গেছে যে, ১০ জন কৃষিজীবী নেতার মধ্যে ৮ জনের কৃষির পাশাপাশি ব্যবসা রয়েছে। একইভাবে ২ জন চিকিৎসক নেতার মধ্যে ২ জনই স্ব-পেশার পাশাপাশি চিকিৎসা বিষয়ক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। বেসরকারী চাকুরীজীবী ৫ জনের মধ্যে ১ জন দ্বিতীয় পেশা হিসাবে ব্যবসাকে গ্রহণ করেছেন। মধ্যবিত্ত পেশাজীবীদের মধ্যে মূল পেশার সঙ্গে দ্বিতীয় পেশা হিসাবে ব্যবসা রয়েছে এমন নেতাদের মোট শতকরা হার ১৫। তবে আইনজীবী ও শিক্ষক নেতাদের মধ্যে এই প্রবণতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। অতত্রব, উচ্চবিত্ত শ্রেণীর নেতাদের মোট শতকরা হার (প্রত্যক্ষ ব্যবসায়ী ৫৫%, পরোক্ষ ব্যবসায়ী ১৫%, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলা ৯%) ৭৯।

তাহলে গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, সাম্প্রতিক সময়ের বিএনপি'র ৩/৪ অংশের (৭৯%) বেশী নেতা এসেছেন উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিএনপি শুরু থেকেই উচ্চবিত্ত শ্রেণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবান্বিত একটি দল। গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিএনপি তার প্রারম্ভিক সময়ের অবস্থান থেকে সরে আসেনি বরং পুরনো অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে।

৫.৩.৩ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের পেশাগত অবস্থানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ঃ

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতৃত্বের পেশাগত অবস্থানের তুলনামূলক বিশ্লেষণের পূর্বে যে বিষয়টি উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রয়োজন তা হলো, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মধ্যবিত্ত পেশাজীবী শ্রেণী দ্বারা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ সুরক্ষাই আওয়ামী লীগের মূল অঙ্গীকার ছিল। অপরদিকে, বিএনপি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমাজের উচু স্তর থেকে। নেতা যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে আসেন, সেই পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তাকে কিছুটা হলেও প্রভাবিত করে। এ কারণে বিএনপি'তে উচ্চবিত্তের প্রভাব বরাবরই বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু আওয়ামী লীগের ১০০ জন উদীয়মান নেতার উপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে, সেখানে শতকরা ৪৪ জন নেতা ব্যবসায়ী এবং ১৭ জন অবসরপ্রাপ্ত আমলা। অর্থাৎ উচ্চবিত্ত নেতার মোট শতকরা হার ৬১। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা, মধ্যবিত্তের স্বার্থে। অথচ সেই আওয়ামী লীগে বর্তমান সময়ে উচ্চবিত্ত উদীয়মান নেতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬১%। এ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আওয়ামী লীগ তার প্রারম্ভিক সময়ের অবস্থান থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে।

অপরদিকে বিএনপি'র ১০০ জন উদীয়মান নেতার মধ্যে ব্যবসায়ী ৫৫ জন এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলা ৯ জন অর্থাৎ মোট উচ্চবিত্তের হার ৬৪%। তবে একটা বিষয় লক্ষণীয় আর তা হচ্ছে, আওয়ামী লীগে বিএনপি'র তুলনায় উচ্চবিত্ত উদীয়মান নেতার সংখ্যা কম হলেও অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলার সংখ্যা বেশি। এর কারণ হিসাবে দেখা গেছে যে, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলারা অধিকাংশ এসেছেন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। যেহেতু আওয়ামী লীগের পরিচিতি রয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দল হিসাবে (যদিও আওয়ামী লীগ তার পূর্বের অবস্থানে নেই), সেহেতু এসব অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলারা পারিবারিকভাবে এবং মানসিকভাবে উৎসাহিত হন আওয়ামী লীগের রাজনীতির প্রতি। অন্যদিকে বিএনপি'র বিকাশ উচ্চবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা, তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত অবসরপ্রাপ্ত আমলাগণ (সামরিক ও বেসামরিক) বিএনপি'র প্রতি কিছুটা কম উৎসাহিত হন।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হার কম হলেও উপেক্ষিত নন। আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিভিন্ন পেশার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতার শতকরা হার ৩৯। আওয়ামী লীগের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শতকরা হারের অনুপাত হচ্ছে ঃ

উচ্চবিত্ত ঃ মধ্যবিত্ত

৬১ ঃ ৩৯

অপরদিকে, বিএনপি'র মধ্যবিত্ত পেশাজীবী উদীয়মান নেতাদের শতকরা হার যথাক্রমে আইনজীবী ১২%, কৃষিজীবী ১০%, বেসরকারী চাকুরীজীবী ৫%,

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসক ২%, শিক্ষক ৪%, অন্যান্য ৪%। এখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মোট শতকরা হার হচ্ছে ৩৬।

বিএনপি'র উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নেতাদের অনুপাত নিম্নরূপ ঃ

উচ্চবিত্ত ঃ মধ্যবিত্ত

৬৪ ঃ ৩৬

উপরোক্ত অনুপাতগুলো থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, দুই দলেই উচ্চবিত্ত নেতার সংখ্যা বাড়ছে এবং মধ্যবিত্ত নেতার সংখ্যা কমছে।

আওয়ামী লীগের উচ্চবিত্ত উদীয়মান নেতা ঃ বিএনপি'র উচ্চবিত্ত উদীয়মান নেতা

৭২ ঃ ৭৯

আওয়ামী লীগের উদীয়মান মধ্যবিত্ত নেতা ঃ বিএনপির উদীয়মান মধ্যবিত্ত নেতা

২৮ ঃ ১১

উপরোক্ত অনুপাত থেকে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগের তুলনায় বিএনপি'তে উচ্চবিত্ত নেতার সংখ্যা বেশী। কারণ বিএনপি'র শুরু হয়েছিল উচ্চবিত্ত শ্রেণীকে সঙ্গে নিয়ে। এখনও বিএনপি'র প্রতি উচ্চবিত্ত শ্রেণীর নেতাদের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ কমেনি।

অপরদিকে, বিএনপি'র তুলনায় আওয়ামী লীগে মধ্যবিত্ত নেতাদের সংখ্যা বেশী। কারণ আওয়ামী লীগ সৃষ্টি হয়েছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা। যদিও '৭৫–এর ১৫ আগস্ট পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ তার রাজনৈতিক দর্শন পরিবর্তন করেছে। তবুও কিছু পুরনো প্রবণতা থেকেই গেছে। তাই মধ্যবিত্তদের অংশগ্রহণের মাত্রা পূর্বের তুলনায় কমে আসলেও বিএনপি'র তুলনায় এখনও বেশী।

উভয় দলের উদীয়মান নেতাদের মধ্যে পেশাগত অবস্থানের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও, কোন পেশাগত মৌলিক পার্থক্য গবেষণায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে উভয় দলের উদীয়মান নেতাদের পেশাগত অবস্থান নির্ণয়ে যে

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে মিল তা হচ্ছে ব্যবসায়ীরা রাজনৈতিক নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় অংশ জুড়ে আছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলারা (সামরিক ও বেসামরিক)।

অথচ ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এদেশের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিভিন্ন পেশার মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। যেমন– আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে যে, এইসব পেশাজীবীরা আর আগের মত তাদের অবস্থান ধরে রাখতে পারছেন না। রাজনীতি প্রবলভাবে ধনিক শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। উচ্চবিত্তরা রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, যাতে করে তাঁরা সরকারী ক্ষমতা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও ৪০% জনগণ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। তারা বঞ্চিত হচ্ছে তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা থেকে। ধনিক শ্রেণীর বলয়ে এমনভাবে রাজনীতি আটকে যাচ্ছে যে, এদেশে এখন আর কৃষক বিদ্রোহ হয়না, এমনকি পেশাজীবীদের আন্দোলনও দূর্বল হয়ে পড়েছে।

৫.৪ বাৎসরিক আয়ের পরিমান ঃ

রাজনৈতিক আলোচনায় নেতার সামজিক অবস্থান, পেশাগত অবস্থান সবসময় গুরুত্ব পায়। কিন্তু নেতাদের আয়-ব্যয়ের বিষয়টা অনেক সময় অনুল্লেখিত রয়ে যায়। নেতা কি পরিমান আয় করেন, কোন উৎস থেকে আয় করেন, একাধিক আয়ের উৎস আছে কিনা, রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে আয়ের ক্ষেত্রে কি পরিমান সমতা ও অসমতা কাজ করছে, এগুলোর উপর খুব বেশী সচেতন জরিপ ভিত্তিক বিশ্লেষণ হয়নি। অথচ নেতা কি পরিমান আয় করেন, কিভাবে আয় করেন, তার উপর নেতার রাজনৈতিক গতি-বিধি অনেকখানি নির্ভর করে। তাই সঙ্গত কারণে, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের মধ্যে থেকে যে ১০০ জন করে নেতাকে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, তাদের বাৎসরিক আয়ের পরিমানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে শতকরা হার নিম্নোক্তভাবে নির্ণয় করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৫.৩

উদীয়মান নেতাদের বাৎসরিক আয়ের পরিমান (শতকরা হার)

দলের নাম	১০ হাজার টাকা থেকে ৯৯ হাজার পর্যন্ত	১ লক্ষ টাকা থেকে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৩ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১০ লক্ষ ১ টাকা থেকে উর্ধ্বে
আওয়ামী লীগ	৫%	২৯%	১৬%	২২%	২৮%
বিএনপি	৫%	৩২%	৮%	১৬%	৩৯%

উভয় দলের উদীয়মান নেতাদের আয়ের পরিমানের উপর যে জরিপ চালানো হয়েছে তাতে দেখা যায় উভয় দলের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল রয়েছে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে অমিলও রয়েছে। তাই উপরোক্ত জরিপের ফলাফলের উপর দলভিত্তিক পৃথক বিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ খুবই জরুরী।

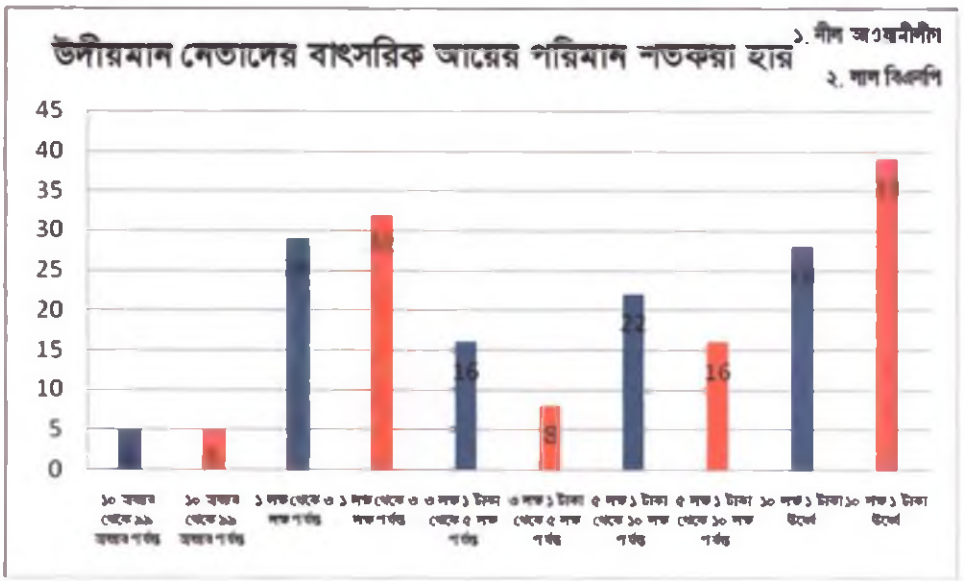

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.১ আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের আয়ের পরিমান (শতকরা হার) বিশ্লেষণ ঃ

আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতৃত্বের মধ্যে যাদের আয় ১০ হাজার টাকা থেকে ৯৯ হাজার টাকা পর্যন্ত তাদের নিম্ন আয় পর্যায়ভুক্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে। নিম্ন আয়ের নেতার সংখ্যা ১০০ জনের মধ্যে মাত্র ৫ জন। আবার যাদের আয় ১ লক্ষ টাকা থেকে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদের নিম্ন মধ্যম আয়ের পর্যায়ভুক্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে। এই নিম্ন মধ্যম আয়ের নেতার সংখ্যা ১০০ জনের মধ্যে ২৯ জন। একইভাবে যাদের আয় ৩ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদের সনাক্ত করা হয়েছে মধ্যম আয়ের নেতা হিসাবে। এমন আয়ের নেতার সংখ্যা ১০০ জনের মধ্যে ১৬ জন। অনুরূপভাবে যাদের আয় ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে উচ্চ মধ্যম আয়ের নেতা হিসাবে। এমন নেতার সংখ্যা ১০০ জনের মধ্যে ২২ জন। আর যাদের আয় ১০ লক্ষ ১ টাকা থেকে উর্ধ্বে তাদের বলা হয়েছে উচ্চ আয়ের নেতা। এ রকম নেতার সংখ্যা ১০০ জনের মধ্যে ২৮ জন।

উপরোক্ত জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, "নিম্ন আয়ের" নেতার সংখ্যা সবচেয়ে কম, ৫%। কিন্তু "নিম্ন আয়ের" নেতার সংখ্যা কম হলেও "নিম্ন মধ্যম আয়ের" নেতার সংখ্যা সর্বোচ্চ অর্থাৎ শতকরা ২৯ জন। উচ্চ আয়ের নেতাদের সংখ্যা নিম্নমধ্যম আয়ের নেতাদের প্রায় সমান, মাত্র ১ ভাগ কম। আবার দেখা যায় মধ্যম আয়ের ও উচ্চমধ্যম আয়ের নেতাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। "মধ্যম আয়ের" নেতা ১৬% এবং "উচ্চ মধ্যম" আয়ের নেতা ২২%। এই উভয় শ্রেণীর নেতাদের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয়ের নেতাদের সংখ্যা বেশী।

এখানে "নিম্ন আয়" ও "উচ্চ আয়ের" নেতাদের বাদ দিয়ে, তিন ধরনের মধ্যম (নিম্ন মধ্যম + মধ্যম + উচ্চ মধ্যম) আয়ের নেতাদের সম্মিলিত সংখ্যা ১০০ জনের মধ্যে ৬৭ জন অর্থাৎ ৬৭%। এই ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে মধ্যম আয়ের নেতাদের আধিপত্য আওয়ামী লীগে বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

এ দলে "নিম্ন আয়ের" নেতাদের উপস্থিতি খুবই সীমিত অর্থাৎ মাত্র ৫%। উদীয়মান নিম্ন আয়ের নেতাদের সংখ্যা কম হওয়ায় এটা স্পষ্ঠ যে, আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে "নিম্ন আয়ের" নেতাদের প্রভাব, আগ্রহ, অংশগ্রহণ কমে আসছে। নিম্ন আয়ের নেতাদের সংখ্যা কমে গেলেও নিম্ন মধ্যম আয়ের নেতাদের শতকরা হার বেশী গুরুত্বপূর্ণ (২৯%)।

যেখানে "নিম্নমধ্যম", "মধ্যম", "উচ্চমধ্যম" আয়ের নেতাদের অর্থাৎ মধ্যম আয়ের নেতাদের শতকরা হার ৬৭, সেখানে এটা পরিস্কার যে, নিম্ন আয়ের লোকদের আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রতিপত্তি খুবই কম। তবে ধনিক শ্রেণী বা উচ্চ আয়ের নেতাদের রাজনীতিতে আগ্রহ তুলনামূলকভাবে বেশী। এখানে যাদের মধ্যম (নিম্নমধ্যম, মধ্যম, উচ্চমধ্যম) আয়ের নেতা হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এরা আসলে উঠতি ধনিক শ্রেণীর তিনটি স্তর। এদের প্রভাব, আধিপত্য, দলের ভিতর সংখ্যাগত অবস্থান খুবই শক্তিশালী। এরাই দলে গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

আওয়ামী লীগের ১০০ জন উদীয়মান নেতার বাৎসরিক আয়ের পরিমান জরিপের পাশাপাশি তাদের আয়ের উৎসের উপরও গবেষণা করা হয়েছে। যেমন– "নিম্ন আয়ের" নেতাদের শতকরা ৫%-এর মধ্যে ৪%-ই একক উৎস থেকে আয় করেন। "নিম্ন মধ্যবিত্ত" নেতাদের ২৯%-এর ভিতর ৮% নেতা একক উৎস থেকে আয় করেন। মধ্যবিত্ত নেতাদের ১৬%-এর মধ্যে ৬%, উচ্চমধ্যবিত্ত" নেতাদের ২২%-এর মধ্যে ৩% এবং উচ্চবিত্ত নেতাদের ২৮%-এর মধ্যে ৪% নেতা একক উৎস থেকে আয় উপার্জন করেন। গবেষণা পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বিভিন্ন শ্রেণীর ২৫% নেতা একক উৎস থেকে আয় করেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ১০০ জন নেতার মধ্যে একক উৎস থেকে আয় করেন ২৫ জন নেতা। অর্থাৎ ১/৪ অংশ নেতা একক উৎস থেকে আয় করে থাকেন। বাকি ৭৫ জন অর্থাৎ ৩/৪ অংশ নেতা একাধিক উৎস থেকে আয় করে থাকেন। একক উৎস হিসাবে ব্যবসা এবং নিজস্ব পেশা পরিলক্ষিত হয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, একক আয়ের উৎস হিসাবে এখনও কোন কোন নেতা কৃষিকে

Dhaka University Institutional Repository

ধরে রেখেছেন। যেমন– নিম্ন আয়ের ৫% নেতার মধ্যে ৩% নেতা একক উৎস হিসাবে কৃষি থেকে উপার্জন করেন। তবে নিম্নমধ্যম, মধ্যম, উচ্চমধ্যম ও উচ্চ আয়ের নেতাদের মধ্যে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি যিনি একক আয়ের উৎস হিসাবে কৃষিকে ধরে রেখেছেন।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিম্নবিত্তের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ যেমন কমে যাচ্ছে, তেমনি কৃষক নেতার সংখ্যা সীমিত হয়ে আসছে।

আবার, নেতৃত্বের মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া যেমন লাগছে, তেমনই শহুরে জীবনের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তাই দেখা যায় যে, বিভিন্ন শ্রেণীর নেতাদের মধ্যে একক আয়ের উৎস হিসাবে বাড়ী, এপার্টমেন্ট, দোকানভাড়া থেকে আয় উপার্জনকারী নেতার সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। যেমন– "নিম্ন আয়ের" নেতাদের মধ্যে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, যিনি একক আয়ের উৎস হিসাবে বিভিন্ন ধরনের বাড়ী, দোকান ভাড়াকে গ্রহণ করেছেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত ২৯% নেতার মধ্যে ১% নেতা বিভিন্ন ধরনের ভাড়ার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। মধ্যম আয়ের ১৬% নেতার মধ্যে ১% একক আয়ের উৎস হিসাবে বিভিন্ন ধরনের ভাড়াকে গ্রহণ করেছেন। উচ্চ মধ্যবিত্ত ২২% নেতার মধ্যে ২%-এর একক আয়ের উৎস বিভিন্ন ধরনের ভাড়া। উচ্চবিত্ত নেতাদের ২৮%-এর মধ্যে ২% কে পাওয়া যায়, বিভিন্ন ধরনের ভাড়া যাদের একক আয়ের উৎস।

সুতরাং, একক আয়ের উৎস হিসাবে বিভিন্ন ধরনের ভাড়া থেকে আয় গ্রহণকারী উদ্দীয়মান নেতার মোট সংখ্যা হচ্ছে (নিম্নবিত্ত ০%, নিম্নমধ্যবিত্ত ১%, মধ্যবিত্ত ১%, উচ্চ মধ্যবিত্ত ২%, উচ্চবিত্ত ২%) ৬ জন। যেহেতু ১০০ জন উদ্দীয়মান নেতার মধ্যে মাত্র ৬ জন একক উৎস হিসাবে বিভিন্ন ধরনের ভাড়া থেকে আয় উপার্জন করেন, সেহেতু এ সংখ্যা খুবই নগণ্য। কিন্তু একক আয়ের উৎস হিসাবে কৃষিকে গ্রহণ করেছেন মাত্র ৩ জন। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান হওয়া সত্বেও যেখানে ৬ জন একক আয়ের উৎস হিসাবে ভাড়াকে গ্রহণ করেছেন, তা একক আয়ের উৎস হিসাবে কৃষির দ্বিগুণ। এই পর্যবেক্ষণ থেকে এটাই প্রমাণিত

Dhaka University Institutional Repository

হয় যে, নেতাদের মধ্যে শহরভিত্তিক উৎস থেকে আয়-উপার্জনের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে।

অপরপক্ষে, একাধিক আয়ের উৎস থেকে আয় উপার্জনকারী নেতার সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ। পর্যবেক্ষণে একাধিক আয়ের উৎস হিসাবে অন্যান্য পেশার সঙ্গে কৃষিকে গ্রহণকারী উদীয়মান নেতার উপর জরিপ চালিয়ে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা হল ঃ

"নিম্নবিত্ত" নেতাদের শতকরা ৫ জনের মধ্যে ১ জনের একাধিক আয়ের উৎস হিসাবে শুধুমাত্র কৃষি রয়েছে। 'নিম্ন মধ্যবিত্ত' নেতাদের শতকরা ২৯ জনের মধ্যে ১১ জনের একাধিক আয়ের উৎস হিসাবে অন্যান্য পেশার সঙ্গে কৃষি রয়েছে। এই শতকরা ১১ জনের মধ্যে ৪ জনের শুধুমাত্র সহায়ক পেশা হিসাবে কৃষি রয়েছে।

'মধ্যবিত্ত' নেতাদের শতকরা ১৬ জনের মধ্যে ৫ জনের একাধিক উৎস হিসাবে কৃষি রয়েছে। এই শতকরা ৫ জনের ভিতরও ২ জনের প্রধান পেশার একমাত্র সহযোগী পেশা হিসাবে কৃষি রয়েছে। 'উচ্চমধ্যবিত্ত' নেতাদের শতকরা ২২ জনের মধ্যে ১০ জনের অন্যান্য আয়ের উৎসের সঙ্গে কৃষি রয়েছে। এই ১০ জনের মধ্যে আবার ২ জনের শুধু কৃষিই একাধিক আয়ের উৎস বা দ্বিতীয় পেশা।

'উচ্চবিত্ত' নেতাদের শতকরা ২৮ জনের মধ্যে ১০ জনের একাধিক আয়ের উৎস হিসাবে কৃষি রয়েছে। এই ১০ জনের মধ্যে আবার ১ জনের দ্বিতীয় পেশা শুধুমাত্র কৃষি।

অতত্রব, ১০০ জন উদীয়মান নেতার মধ্যে কৃষির উপর পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল নেতার সংখ্যা যথাক্রমে (নিম্নবিত্ত ১, নিম্ন মধ্যবিত্ত ১১, মধ্যবিত্ত ৫, উচ্চ মধ্যবিত্ত ১০, উচ্চবিত্ত ১০) ৩৭ জন।

Dhaka University Institutional Repository

এই ৩৭ জনের মধ্যে আবার দেখা যায় যে, নিম্নবিত্ত ০, নিম্নমধ্যবিত্ত ৪, মধ্যবিত্ত ২, উচ্চমধ্যবিত্ত ২, উচ্চবিত্ত ২, অর্থাৎ মোট ১০ জন সরাসরি দ্বিতীয় পেশা হিসাবে কৃষি থেকে আয় গ্রহণ করেন। এই ১০ জনকে পরোক্ষ কৃষক নেতা বলা যায়।

তাছাড়া আরো ৩০ জন কোন না কোনভাবে কৃষি থেকে আয় করে থাকেন। তাহলে দেখা যায় যে, শতকরা ৪০ জন নেতা এখনও কৃষি থেকে আয় গ্রহণ করেন বা কৃষির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

আবার, একাধিক আয়ের উৎস হিসাবে কৃষির পাশাপাশি ভাড়া থেকে আয়কেও স্থান দেওয়া যায়। যেমন– 'নিম্নবিত্ত' নেতাদের শতকরা ৫ জনের মধ্যে একাধিক আয়ের উৎস হিসাবে কারোই ভাড়া হতে আয় নেই। 'নিম্ন মধ্যবিত্ত' নেতাদের শতকরা ২৯ জনের মধ্যে ৯ জনের একাধিক আয়ের উৎস হিসাবে বিভিন্ন ধরনের ভাড়া থেকে আয় রয়েছে। এই ৯ জনের মধ্যে আবার ৫ জনের একাধিক আয়ের উৎস হিসাবে ভাড়া রয়েছে। তাঁদের অন্য কোন আয়ের উৎস নেই।

'মধ্যবিত্ত' নেতাদের শতকরা ১৬ জনের মধ্যে ৪ জন একাধিক আয়ের উৎস হিসাবে বিভিন্ন ধরনের ভাড়া থেকে আয় সংগ্রহ করে থাকেন। এই ৪ জনের মধ্যেও ২ জন প্রধান পেশার একমাত্র সহায়ক পেশা হিসাবে বিভিন্ন ধরনের ভাড়াকে গ্রহণ করেছেন।

'উচ্চ মধ্যবিত্ত' নেতাদের শতকরা ২২ জনের মধ্যে ৬ জনের একাধিক আয়ের উৎস হিসাবে ভাড়া রয়েছে। এই ৬ জনের মধ্যেও আবার ৫ জন দ্বিতীয় পেশা হিসাবে ভাড়া থেকে আয় উপার্জন করেন।

'উচ্চবিত্ত' নেতাদের শতকরা ২৮ জনের মধ্যে ১৫ জনের বিভিন্ন ধরনের ভাড়া থেকে আয় গ্রহণ অন্যতম। এই ১৫ জনের মধ্যে ৭ জনের অতিরিক্ত আয়ের উৎস বিভিন্ন ধরনের ভাড়া।

Dhaka University Institutional Repository

অতত্রব, ভাড়া থেকে আয় গ্রহণকারী নেতার মোট সংখ্যা হচ্ছে ৩৪ জন। এই ৩৪ জনের মধ্যে আবার ২১ জন প্রধান পেশার একমাত্র সহায়ক পেশা হিসাবে ভাড়াকে গ্রহণ করেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কৃষির মত ভাড়া থেকে আয় গ্রহণকারী নেতার শতকরা হার ৪০ জন।

তাহলে, কৃষি থেকে আয় উপার্জনকারী, ভাড়া থেকে আয় উপার্জনকারী ও অন্যান্য উৎস (ব্যাংক আমানত, শেয়ার, একক পেশা) থেকে আয় উপার্জনকারী নেতাদের অনুপাত করলে যা দাঁড়ায় তা নিম্নরূপ ঃ

কৃষি থেকে উৎপাদন ঃ	ভাড়া থেকে উৎপাদন ঃ	অন্যান্য উৎস থেকে উৎপাদন
৪০	৪০	২০

গবেষণা পর্যবেক্ষণের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগে কৃষি থেকে আয় উপার্জনকারী নেতা ও ভাড়া থেকে আয় উপার্জনকারী নেতার শতকরা হার সমান। আওয়ামী লীগে যেসব নেতা সরাসরি কৃষি থেকে আয় গ্রহণ করেন তারা শহরে বসবাস করলেও গ্রামের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। অনুরূপভাবে ভাড়া থেকে আয় উপার্জনকারীরা প্রথমত শহরের বাসিন্দা, দ্বিতীয়ত তাঁরা হয় ধনী নয়ত উঠতি ধনিক শ্রেণীভূক্ত।

৫.৪.২ বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের বাৎসরিক আয়ের পরিমান ঃ

বিএনপি'র উদীয়মান ১০০ জন নেতার মধ্যে 'নিম্নবিত্ত' নেতার শতকরা হার মাত্র ৫। 'উচ্চবিত্ত' নেতার শতকরা হার ৩৯ – যা উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত নেতাদের দলের ভিতর যথেষ্ট ব্যবধানকে স্পষ্ট করেছে। কারণ উচ্চবিত্ত নেতার সংখ্যা নিম্নবিত্ত নেতার কয়েকগুণ বেশী। উদীয়মান নেতাদের বার্ষিক আয়ের পরিমানের উপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে, বিএনপি'র রাজনীতিতে উদীয়মান উচ্চবিত্তরা বেশি প্রভাবশালী। উদীয়মান নেতাদের মধ্যে 'নিম্ন মধ্যবিত্ত' শ্রেণীর শতকরা হার ৩২। 'মধ্যবিত্ত' নেতাদের শতকরা হার ৮। উচ্চ মধ্যবিত্ত নেতাদের শতকরা হার মাত্র ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়, নিম্ন আয়ভুক্ত নেতাদের সংখ্যা যেখানে ১০০ জনের মধ্যে ৫ জন, সেখানে 'নিম্ন মধ্যবিত্ত' নেতার সংখ্যা ১০০ জনের মধ্যে ৩২ জন, যা উদীয়মান নেতাদের শতকরা হারের দিক দিয়ে দ্বিতীয়। উদীয়মান নেতাদের মধ্যে জরিপে সর্বোচ্চ সংখ্যক নেতা এসেছেন উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে।

শতকরা হারের ক্রমিক অনুযায়ী ১০০ জন উদীয়মান নেতার শ্রেণী বিন্যাস করলে দেখা যাবে যে–

৩৯% উচ্চবিত্ত
৩২% নিম্ন মধ্যবিত্ত
১৬% উচ্চ মধ্যবিত্ত
৮% মধ্যবিত্ত
৫% নিম্নবিত্ত

শতকরা হারের ক্রমানুসারে দেখা যায় যে, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নেতাদের সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি। যদিও উভয়ের আয়ের পরিমানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। আবার মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত নেতাদের শতকরা হারের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। তবে এক্ষেত্রে উচ্চ মধ্যবিত্ত নেতারাই দলে প্রভাবশালী; যদিও উভয় শ্রেণীর নেতাদের মধ্যে আয়ের পরিমানের ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান।

এই বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় যে, বিএনপি'র রাজনীতিতে শুরু থেকেই নিম্ন আয়ের নেতাদের উপস্থিতি যেমন কম ছিল, তা বর্তমানে উদীয়মান নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

অপরদিকে, উচ্চবিত্ত শ্রেণী বিএনপি'র রাজনীতিতে প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে আজ পর্যন্ত প্রভাবশালী। তাই বর্তমান উদীয়মান নেতাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এ কারণেই উদীয়মান নেতাদের ১০০ জনের মধ্যে ৩৯ জনকে পাওয়া যায় উচ্চবিত্ত শ্রেণী হতে আগত হিসাবে, যা শতকরা হারের সর্বোচ্চ সংখ্যক।

Dhaka University Institutional Repository

আবার তিন মধ্যম শ্রেণীর নেতাদের শতকরা হার যোগ করা হলে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬% ।

যদিও উপরোক্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, মধ্যবিত্ত নেতাদের সংখ্যাই দলে বেশী, কিন্তু মধ্যবিত্ত নেতাদের মধ্যেও যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান । যেমন– নিম্ন মধ্যবিত্ত নেতারা ৩২%, মধ্যবিত্ত নেতা ৮% এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত নেতা ১৬% । তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, নিম্ন মধ্যবিত্ত নেতাদের সংখ্যা মধ্যবিত্ত নেতাদের চারগুণ এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত নেতাদের দুইগুণ । অতত্রব, মধ্যম আয়ের নেতাদের মধ্যেও দেখা যায় যে, নিম্ন মধ্যবিত্ত নেতারা খুবই প্রভাবশালী । এই নিম্ন মধ্যবিত্ত নেতাদের ব্যক্তিগত তথ্য পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, এদের মধ্যে সামান্য কিছু চাকুরীজীবী থাকলেও অধিকাংশই ব্যবসায়ী এবং উঠতি ধনিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ।

তবে, উদীয়মান নেতাদের উপর জরিপের ফলাফলে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বর্তমানে বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের মধ্যে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর নেতারাই দলের ভিতর সবচেয়ে প্রভাবশালী ।

আয়ের উৎসের উপর জরিপ করে দেখা গেছে যে, 'নিম্ন আয়ের' ৫%-এর মধ্যে ৪% একক উৎস থেকে আয় করেন । কিন্তু অন্য শ্রেণীভুক্ত নেতাদের মধ্যে একক উৎস থেকে আয় উপার্জনকারীর সংখ্যা নিম্নবিত্ত নেতাদের থেকে কম । যেমন– 'নিম্ন মধ্যবিত্ত' নেতাদের শতকরা ৩২ জনের মধ্যে ৬ জন একক উৎস থেকে আয় উপার্জন করে থাকেন । 'মধ্যবিত্ত' ৮% নেতার মধ্যে ৪% একক উৎস থেকে আয় উপার্জন করেন । 'উচ্চ মধ্যবিত্ত' ১৬% নেতাদের মধ্যে ৩% একক উৎস থেকে আয় করেন । 'উচ্চবিত্ত' ৩৯% নেতাদের মধ্যে ১০% একক উৎস থেকে আয় উপার্জন করে থাকেন । তাহলে, একক উৎস থেকে আয় উপার্জনকারী বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের শতকরা হার হচ্ছে নিম্নবিত্ত ৪, নিম্ন মধ্যবিত্ত ৬, মধ্যবিত্ত ৪, উচ্চ মধ্যবিত্ত ৩ ও উচ্চবিত্ত ১০ । অর্থাৎ মোট ২৭ জন ।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ১০০ জন উদীয়মান নেতার মধ্যে ২৭ জন একক উৎস থেকে আয় করেন। বাদ বাকি ৬৩ জন একাধিক উৎস থেকে আয় করেন। অর্থাৎ ১০০ জনের মধ্যে ৬৩ জন একাধিক উৎস থেকে আয় করেন বা ৩/৪ অংশের কিছু বেশি নেতা একাধিক উৎস থেকে উপার্জন করেন।

অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের একক আয়ের উৎস হিসাবে প্রধানতঃ ব্যবসা, তারপর বেসরকারী চাকুরীর বেতন-ভাতা ইত্যাদি রয়েছে। গবেষণা পর্যবেক্ষণে আরো দেখা যায় যে, বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের মধ্যে একক আয়ের উৎস হিসাবে কোন কোন নেতা কৃষিকে ধরে রেখেছেন। যেমন– 'নিম্নবিত্ত' নেতাদের শতকরা ৫ জনের মধ্যে ৪ জন একক উৎস থেকে আয় করেন। এই ৪ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন একক আয়ের উৎস হিসাবে শুধুমাত্র কৃষি থেকে আয় উপার্জন করেন। একইভাবে 'নিম্ন মধ্যবিত্ত' নেতাদের শতকরা ৩২ জনের মধ্যে ৬ জন একক উৎস থেকে আয় করেন। এই ৬ জনের মধ্যে ১ জনের একক আয়ের উৎস শুধুমাত্র কৃষি। আবার, 'উচ্চ মধ্যবিত্ত' নেতাদের শতকরা ১৬ জনের মধ্যে ৩ জন একক উৎস থেকে আয় করেন। এই ৩ জনের মধ্যে ১ জন একক উৎস হিসাবে কৃষি থেকে আয় গ্রহণ করেন। তবে 'মধ্যবিত্ত' ও 'উচ্চবিত্ত' নেতাদের মধ্যে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি যার একক আয়ের উৎস কৃষি। দেখা গেছে যে, বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের মধ্যে শতকরা ৩ জন প্রত্যক্ষ কৃষক নেতা। যদিও এটা দলের ভিতর কৃষক নেতাদের দূর্বল উপস্থিতিকে নির্দেশ করে। তবে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য আর তা হলো– 'নিম্নবিত্ত' নেতাদের মধ্যেও যেমন কৃষক নেতা রয়েছেন, 'উচ্চ মধ্যবিত্ত' নেতাদের মধ্যেও তেমনি কৃষক নেতা রয়েছে, যদিও তা খুবই সীমিত।

একক আয়ের উৎস হিসাবে যেমন কৃষি রয়েছে তেমনি একক আয়ের উৎস হিসাবে বিভিন্ন ধরনের ভাড়াকে কোন কোন নেতা গ্রহণ করেছেন। তবে, তা একটি বিশেষ শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ। আর তা হচ্ছে– উচ্চবিত্ত শতকরা ৩৯ জনের মধ্যে ২ জন একক আয়ের উৎস হিসাবে ভাড়া থেকে আয় উপার্জন করেন। অন্য শ্রেণীভুক্ত নেতাদের মধ্যে ভাড়াকে একক আয়ের উৎস হিসাবে গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, একক আয়ের উৎস হিসাবে ভাড়াকে ব্যবহার করছেন এমন নেতাদের মোট হার ২%। অর্থাৎ ১০০ জন নেতার মধ্যে মাত্র ২ জন একক আয়ের উৎস হিসাবে ভাড়াকে গ্রহণ করেছেন। এই ফলাফল থেকে যদিও প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র পেশা হিসাবে ভাড়া থেকে উপার্জনকারী নেতাদের উপস্থিতি দলে খুবই সীমিত। তবুও এরা শুধুমাত্র 'উচ্চবিত্ত' শ্রেণীতে অবস্থান করছেন, যদিও সেখানে তারা ৩৯%-এর মধ্যে ২% অর্থাৎ খুবই নগণ্য।

তবে একাধিক আয়ের উৎস হিসাবে কৃষি ও ভাড়া বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিকে একাধিক আয়ের উৎস হিসাবে যারা গ্রহণ করছেন, তাদের উপর জরিপ চালিয়ে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

'নিম্নবিত্ত' নেতাদের শতকরা ৫ জনের মধ্যে ১ জনের একাধিক আয়ের উৎসের মধ্যে অন্যান্য পেশার সঙ্গে কৃষিকে দেখতে পাওয়া যায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত নেতাদের শতকরা ৩২ জনের মধ্যে ১৪ জনের একাধিক আয়ের উৎসের মধ্যে কৃষি রয়েছে। এই ১৪ জনের মধ্যে ১৩ জনের প্রধান পেশার সহযোগী পেশা হচ্ছে কৃষি। অর্থাৎ তাদের আয়ের আর কোন উৎস নেই। মধ্যবিত্ত নেতাদের শতকরা ৮ জনের মধ্যে ৩ জনের একাধিক আয়ের উৎসের মধ্যে কৃষি রয়েছে। এই ৩ জনের মধ্যে ২ জনের দ্বিতীয় পেশা বা আয়ের উৎস হিসাবে শুধুমাত্র কৃষি রয়েছে। উচ্চ মধ্যবিত্ত নেতাদের শতকরা ১৬ জনের মধ্যে ৯ জনের একাধিক আয়ের উৎসের মধ্যে কৃষি রয়েছে। এই ৯ জনের মধ্যে আবার ২ জনের প্রধান পেশার একমাত্র সহযোগী পেশা কৃষি। উচ্চবিত্ত নেতাদের শতকরা ৩৯ জনের মধ্যে ১৮ জনের একাধিক আয়ের উৎসের সঙ্গে কৃষি রয়েছে। এই ১৮ জনের মধ্যে আবার ৫ জনের দ্বিতীয় পেশা কৃষি। তারা অন্য কোন উৎস থেকে আয় উপার্জন করেন না। অর্থাৎ আয়ের দুটি মাত্র উৎস ঃ প্রধান পেশা ব্যবসা বা প্র্যাকটিস, দ্বিতীয় পেশা কৃষি। দেখা যাচ্ছে যে, ১০০ জন নেতার মধ্যে পরোক্ষভাবে কৃষি সংশ্লিষ্ট নেতার সংখ্যা নিম্নবিত্ত ১, নিম্ন মধ্যবিত্ত ১৪, মধ্যবিত্ত ৩, উচ্চ মধ্যবিত্ত ৯, উচ্চবিত্ত ১৮, অর্থাৎ মোট ৪৫ জন।

Dhaka University Institutional Repository

এই ৪৫ জন নেতার মধ্যে দেখা যায় যে, নিম্নবিত্ত ০, নিম্ন মধ্যবিত্ত ১৩, মধ্যবিত্ত ২, উচ্চমধ্যবিত্ত ২, উচ্চবিত্ত ৫, অর্থাৎ ২১ জনের দ্বিতীয় পেশা হিসাবে সরাসরি কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

এবার, একাধিক আয়ের উৎস হিসাবে বিভিন্ন ধরনের ভাড়া থেকে আয় উপার্জনকারী নেতাদের উপর জরিপের ফলাফলের পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

নিম্নবিত্ত নেতাদের শতকরা ৫ জনের মধ্যে ১ জনের একাধিক আয়ের উৎস হিসাবে শুধুমাত্র ভাড়া থেকে উপার্জন রয়েছে। তাঁর তৃতীয় কোন পেশা নেই।

নিম্ন মধ্যবিত্ত নেতাদের শতকরা ৩২ জনের মধ্যে ১২ জনের একাধিক আয়ের উৎস হিসাবে অন্যান্য উৎসের সঙ্গে ভাড়াও রয়েছে। তবে এই ১২ জনের মধ্যে ৫ জন শুধুমাত্র ভাড়াকে দ্বিতীয় পেশা বা প্রধান পেশার সহযোগী পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাদের তৃতীয় কোন আয়ের উৎস নেই।

মধ্যবিত্ত নেতাদের শতকরা ৮ জনের মধ্যে ১ জনের প্রধান পেশার একমাত্র সহযোগী পেশা বিভিন্ন ধরনের ভাড়া থেকে আয় উপার্জন।

উচ্চ মধ্যবিত্ত নেতাদের শতকরা ১৬ জনের মধ্যে ৪ জনকে পাওয়া গেছে যারা অন্যান্য উৎসের সঙ্গে ভাড়াকেও আয়ের উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই ৪ জনের মধ্যে ২ জনের একমাত্র সহযোগী পেশা হিসাবে বাড়ী ভাড়া, দোকান ভাড়া রয়েছে।

উচ্চবিত্ত নেতাদের শতকরা ৩৯ জনের মধ্যে ১১ জন নেতার একাধিক আয়ের উৎস হিসাবে ভাড়া রয়েছে। এই ১১ জনের মধ্যে আবার ৭ জনকে পাওয়া যায়, যাদের বিভিন্ন ধরনের ভাড়া থেকে আয় উপার্জন রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে, ভাড়া থেকে আয় উপার্জনকারী নেতাদের শতকরা হার হচ্ছে-নিম্নবিত্ত ১, নিম্ন মধ্যবিত্ত ১২, মধ্যবিত্ত ১, উচ্চ মধ্যবিত্ত ৪, উচ্চবিত্ত ১১ অর্থাৎ মোট ২৯ জন।

লক্ষণীয় যে, কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট নেতা বা কৃষি থেকে আয় উপার্জনকারী নেতার শতকরা হার ৪৮ এবং ভাড়া থেকে আয় উপার্জনকারী নেতার শতকরা হার ৩১।

তাহলে, কৃষি ও ভাড়া থেকে আয় উপার্জনকারী নেতার শতকরা হার ৭৯। বাকি ২১% নেতা অন্যান্য উৎস (যেমন– নিজস্ব পেশা, ব্যাংক আমানত, বীমা, শেয়ার ইত্যাদি) থেকে আয় করে থাকেন।

কৃষি ও ভাড়ার উপর নির্ভরশীল ৭৯% উদীয়মান নেতার উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে, ৩/৪ অংশেরও বেশি নেতার মধ্যে গ্রাম নির্ভরতা যেমন আছে, তেমনি শহরে স্থায়ীভাবে বসবাসকারীও আছেন। অর্থাৎ নেতাদের অধিকাংশ গ্রামের সাথে সম্পর্ক রাখলেও জীবিকার প্রয়োজনে হোক বা রাজনীতির কারণে হোক শহরে বসবাস করেন। আবার কোন কোন নেতা আছেন যারা সম্পূর্ণভাবেই শহুরে, তাদের গ্রামের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তবে বেশির ভাগই গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, যারা কৃষি থেকে উপার্জন করেন, তাদের অধিকাংশই উঠতি ধনিক শ্রেণী অথবা ধনিক শ্রেণীভুক্ত। কারণ কৃষি থেকে আয় উপার্জনকারী নেতাদের মধ্যে নিম্ন আয়ের শতকরা ১ জনকে পাওয়া গেছে।

আবার ভাড়া থেকে যারা উপার্জন করেন তাদের মধ্যে উঠতি ধনিক শ্রেণীর প্রাধান্যই বেশী। তবে এখানে দেখা যায় যে, শতকরা ২ জন উচ্চবিত্ত নেতা শুধুমাত্র বিভিন্ন ধরনের ভাড়া থেকে আয় উপার্জন করে থাকেন। এরা অবশ্যই শহুরে প্রভাবশালী ধনিক শ্রেণীর অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বশেষে বলা যায় যে, বিএনপি'র রাজনীতিতে উচ্চবিত্ত শ্রেণী প্রথম থেকেই ছিল। বর্তমানে উদীয়মান নেতৃত্বের মধ্যে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে বাড়তি মাত্রা যুগিয়েছে উঠতি ধনিক শ্রেণী যাদের একটা বড় অংশ গ্রাম থেকে শহরে এসেছেন।

৫.৪.৩ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের বার্ষিক আয়ের পরিমান ঃ তুলনামুলক বিশ্লেষণ

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের বার্ষিক আয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে, যেসব নেতাদের 'নিম্ন আয়' অর্থাৎ যাদের আয় ১০ হাজার টাকা থেকে ৯৯ হাজার টাকা পর্যন্ত তাদের সংখ্যা উভয় দলে খুবই সীমিত।

১০০ জন আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতার উপর প্রাপ্ত তথ্যে এ সংখ্যা মাত্র ৫ জন। অনুরূপভাবে, বিএনপি'র ১০০ জন উদীয়মান নেতার মধ্যেও মাত্র ৫ জন। এই পর্যবেক্ষণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, 'নিম্নবিত্তদের' দলের ভিতর উপস্থিতিও যেমন কম, তেমনি গুরুত্বও কম।

তবে 'নিম্ন মধ্যবিত্ত' অর্থাৎ যাদের আয় ১ লক্ষ টাকা থেকে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদের শতকরা হার আওয়ামী লীগে ২৯ জন এবং বিএনপি'তে ৩২ জন। উভয় দলের নিম্ন মধ্যবিত্ত নেতাদের শতকরা হারের মধ্যে যেমন পার্থক্য বিদ্যমান, তেমনি উভয় দলের নেতাদের দলের মধ্যে অবস্থানেরও ভিন্নতা রয়েছে। বিএনপি'র নিম্ন মধ্যবিত্ত নেতাদের শতকরা হার আওয়ামী লীগ থেকে বেশী হলেও, দলের ভিতরে তাঁরা দ্বিতীয় অবস্থানে। কারণ বিএনপি'র সর্বোচ্চ সংখ্যক নেতা এসেছেন উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে অর্থাৎ যাদের আয় ১০ লক্ষ ১ টাকা থেকে উর্ধ্বে। বিএনপি'র নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আরো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শতকরা ৩২ জনের মধ্যে শতকরা ১৫ জনই বিভিন্নভাবে কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেমন, একক পেশা হিসাবে কৃষি আছে শতকরা ১ জনের। একক সহযোগী পেশা হিসাবে কৃষি আছে শতকরা ১৩ জনের এবং একাধিক সহযোগী পেশা হিসাবে কৃষি আছে শতকরা ১ জনের।

Dhaka University Institutional Repository

আবার ভাড়ার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, নিম্ন মধ্যবিত্ত নেতাদের একক পেশা হিসাবে ভাড়া না থাকলেও, একক সহযোগী পেশা হিসাবে ভাড়া থেকে আয় উপার্জন আছে শতকরা ৫ জনের। একাধিক সহযোগী পেশা হিসাবে ভাড়া আছে শতকরা ৭ জনের। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বিএনপি'র নিম্ন মধ্যবিত্ত নেতাদের মধ্যে যেমন কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা রয়েছেন, তেমনি উঠতি শহুরে ব্যক্তিদের একটা শক্ত অবস্থান রয়েছে।

অথচ, আওয়ামী লীগের নিম্নমধ্যবিত্ত নেতাদের শতকরা হার ২৯ জন, যা বিএনপি'র নিম্ন মধ্যবিত্তদের তুলনায় কম। আওয়ামী লীগে এদের সংখ্যা সর্বোচ্চ। কিন্তু জরিপে উদীয়মান নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী সর্বোচ্চ সংখ্যক হলেও, তাদের একক আয়ের উৎস হিসাবে কৃষি আছে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। একাধিক আয়ের উৎস হিসাবে শতকরা ১১ জনের কৃষি থেকে আয় থাকলেও তার মধ্যে মাত্র ৪ জনের একক সহযোগী পেশা কৃষি। এবং একাধিক সহযোগী পেশা হিসাবে কৃষি আছে শতকরা ৭ জনের।

আবার একক আয়ের উৎস হিসাবে ভাড়া আছে শতকরা ১ জন নেতার। একক সহযোগী পেশা হিসাবে ভাড়া আছে ৫ জনের এবং একাধিক সহযোগী পেশা হিসাবে ভাড়া আছে শতকরা ৪ জনের। অর্থাৎ মোট ১০% এর আয়ের উৎস ভাড়া। আওয়ামী লীগের নিম্ন মধ্যবিত্ত নেতাদের মধ্যে গ্রাম (কৃষি) নির্ভরতা ও শহরে (ভাড়া) নির্ভরতা প্রায় সমান হলেও বিএনপি'র তুলনায় কম। বিষয়টিকে অনুপাতের মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হলো ঃ

আওয়ামী লীগের (গ্রাম + শহর) নির্ভরতা ঃ বিএনপি'র (গ্রাম + শহর) নির্ভরতা

(১১% + ১০%) ঃ (১৫% + ১২%) = ২১% ঃ ২৭%

উপরোক্ত অনুপাত থেকে দেখা যায় যে, বিএনপি'তে যেমন উদীয়মান নিম্ন মধ্যবিত্ত নেতাদের ভিতর গ্রামীণ (কৃষক) নেতা ও উঠতি শহুরে নেতার জোরালো অবস্থান রয়েছে, কিন্তু আওয়ামী লীগের নিম্ন মধ্যবিত্ত উদীয়মানদের মধ্যে গ্রামীণ ও শহুরে নেতাদের দলের ভিতর বিএনপি'র মত বলিষ্ঠ অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

নেই। গবেষণায় আরো দেখা গেছে এসব নেতারা অর্থনৈতিকভাবেও বিএনপি'র নেতাদের থেকে দূর্বল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী অর্থাৎ যাদের আয় ৩ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণী অর্থাৎ যাদের আয় ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ ১ টাকা পর্যন্ত এই উভয় শ্রেণীর নেতাদের অবস্থান বিএনপি'র তুলনায় আওয়ামী লীগে বেশী। মধ্যবিত্ত নেতা আওয়ামী লীগে ১৬% এবং বিএনপি'তে ৮%। আবার উচ্চ মধ্যবিত্ত নেতা আওয়ামী লীগে ২২% এবং বিএনপি'তে ১৬%। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর নেতাদের দুই দলের মধ্যে অবস্থানের ক্ষেত্রে সংখ্যাগত তারতম্য থাকলেও শ্রেণীগত অবস্থানের তেমন কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত নেতাদের মধ্যে যেমন গ্রামীণ নেতা, স্থায়ী শহুরে নেতা আছেন, তেমনি এদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতা এসেছেন পেশাজীবীদের মধ্যে থেকে। আরো একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই উভয় শ্রেণীতে অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ সামরিক-বেসামরিক আমলাদের অবস্থান রয়েছে।

উচ্চবিত্ত শ্রেণী অর্থাৎ যাদের আয় ১০ লক্ষ ১ টাকা থেকে উর্ধ্বে, এসব নেতাদের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যে বড় ধরনের অবস্থানগত পার্থক্য রয়েছে। দেখা যায়, বিএনপি'র উদীয়মান উচ্চবিত্ত নেতা ৩৯% এবং আওয়ামী লীগের উদীয়মান উচ্চবিত্ত নেতা ২৮%। এ থেকে বলা যায় যে, বিএনপি'র উদীয়মান উচ্চবিত্ত নেতার সংখ্যা আওয়ামী লীগের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর নেতাদের তুলনায় অনেক বেশি। আবার দলের ভিতর অবস্থানের দিক দিয়েও তারতম্য রয়েছে। বিএনপি'র উচ্চবিত্ত শ্রেণীর নেতাদের দলের মধ্যে সংখ্যাগত অবস্থান প্রথম, আর আওয়ামী লীগে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর নেতাদের দলের ভিতর সংখ্যাগত অবস্থান দ্বিতীয়।

আয়ের উৎসের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যেখানে আওয়ামী লীগে শতকরা ২৮ জনের মধ্যে ৪ জন একক উৎস থেকে আয় করেন, সেখানে বিএনপি'র শতকরা ৩৯ জনের মধ্যে ১০ জন একক উৎস থেকে আয় করেন। আবার এই ১০ জন একক উৎস থেকে আয়কারীর মধ্যে ২ জনের একমাত্র আয়ের উৎস বাড়ী/দোকান ভাড়া। আওয়ামী লীগের উচ্চবিত্ত নেতাদের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগত তথ্য অনুসন্ধানে শুধুমাত্র ভাড়াকে একমাত্র আয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন এমন তথ্য পাওয়া যায়নি। আবার একাধিক আয়ের উৎসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কৃষি থেকে আয় উপার্জনকারী উচ্চবিত্ত নেতার শতকরা হার আওয়ামী লীগে ১০। এই ১০% এর মধ্যে ২% একক সহযোগী পেশা হিসাবে কৃষিকে গ্রহণ করেছেন। অনুরূপভাবে একাধিক আয়ের উৎস হিসাবে বাড়ী, দোকান ভাড়া হতে আয় উপার্জনকারী নেতার শতকরা হার ১৫। এর মধ্যে ৭%-এর একক সহযোগী আয়ের উৎস শুধুমাত্র ভাড়া।

অপরদিকে বিএনপি'র 'উচ্চবিত্ত' নেতাদের শতকরা ১৮ জন সরাসরি কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এদের মধ্যে একক সহযোগী পেশা হিসাবে কৃষি থেকে আয় উপার্জন করেন মাত্র ৫%। ঠিক একইভাবে ভাড়াকে একাধিক আয়ের উৎস হিসাবে গ্রহণকারী নেতাদের শতকরা হার ১১ জন। এদের মধ্যে ৭% এর একক সহযোগী পেশা ভাড়া। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বিএনপি'র 'উচ্চবিত্ত' নেতাদের মধ্যে সরাসরি কৃষির সঙ্গে এবং ভাড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নেতার শতকরা হার আওয়ামী লীগের উচ্চবিত্ত নেতাদের শতকরা হারের তুলনায় অনেক বেশি। উভয় দলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, বিএনপি'র উচ্চবিত্ত নেতাদের উচ্চভিত্তি আওয়ামী লীগের তুলনায় অনেক বেশি সুসংহত।

উভয় দলের নেতাদের ভিতর তুলনামূলক বিশ্লেষণে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য থাকলেও দলের নেতাদের অবস্থানগত দিক দিয়ে বড় ধরনের মিল রয়েছে। যেমন দেখা যায় যে– আওয়ামী লীগের নিম্নবিত্ত নেতার শতকরা হার সর্বনিম্ন (৫) এবং ঠিক তেমনি বিএনপি'র নিম্নবিত্ত নেতার শতকরা হারও সর্বনিম্ন (৫)। আবার 'নিম্ন মধ্যবিত্ত' ও 'উচ্চবিত্ত' নেতা উভয় দলেই সংখ্যাধিক্য। আওয়ামী লীগে নিম্ন মধ্যবিত্ত ২৯% এবং উচ্চবিত্ত ২৮%। এবং বিএনপি'তে 'নিম্ন মধ্যবিত্ত' ৩২% এবং 'উচ্চবিত্ত' ৩৯%। অপরদিকে আওয়ামী লীগে মধ্যবিত্ত নেতা ১৬% এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত নেতা ২২%। বিএনপি'র মধ্যবিত্ত নেতা ৮% এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত নেতা ১৬%।

জরিপের ফলাফলে এটা প্রমাণিত হয় যে, নিম্নবিত্ত নেতাদের উভয় দলেই অবস্থান ও প্রভাব সীমিত। এবং 'নিম্ন মধ্যবিত্ত' শ্রেণী ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান, প্রভাব, প্রতিপত্তি, গুরুত্ব উভয় দলে খুবই শক্তিশালী। আরো উল্লেখ্য যে, উভয় দলে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসাবে আমরা যাদের পেয়েছি তাদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী শ্রেণী। আবার উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশই ব্যবসায়ী। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, উদীয়মান নেতাদের ভিতর ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রভাব খুবই বেশী। এছাড়া আরো একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য তাহলো আমরা যাদের 'নিম্নমধ্যম', 'মধ্যম', 'উচ্চমধ্যম' শ্রেণী হিসাবে শ্রেণী বিন্যাস করেছি তারা উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশ বিশেষ।

৫.৫ স্থায়ী বাসস্থান ঃ

বাসস্থান স্থায়ী না অস্থায়ী এ বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ শিক্ষার প্রয়োজনে, জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন স্থানে বসবাস করে থাকে। কিন্তু প্রয়োজনের জন্য বসবাসের স্থান যদি ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদ না হয়, তবে তা হবে ব্যক্তির অস্থায়ী বাসস্থান। অতত্রব, বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, নিজস্ব বাড়ীতে ব্যক্তির বসবাস মানেই স্থায়ী বাসস্থান।

৫.৫.১ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতৃত্বের স্থায়ী বাসস্থান সম্পর্কিত আলোচনা ঃ

আমাদের দেশের রাজনীতি মূলত শহর কেন্দ্রীক। এর অন্যতম প্রধান কারণ শহরে নানা পেশার শিক্ষিত মানুষেরা বসবাস করেন, এবং শহরে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমও বেশী। ফলে রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালনা ও বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার প্রেক্ষিতে যেসব আন্দোলন করে থাকে তা বেশির ভাগই শহর কেন্দ্রীক। আবার শহর কেন্দ্রীক রাজনীতির কেন্দ্র স্থল রাজধানী। কারণ আমাদের রাজনীতিতে দেখা যায় যে, দলীয় সংগঠকরা সাধারণত রাজধানীতে বসবাস করেন। এবং রাজধানী থেকে দলীয় কার্যক্রম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে রাজধানীতে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রভাব যেমন বেশি, তেমনই রাজধানীতে রাজনৈতিক নেতাদের বসবাসও বেশী। এ থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে আমাদের দেশে অধিকাংশ উদীয়মান নেতাও কি রাজধানীতে বসবাস করেন? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তরের জন্য উদীয়মান নেতাদের স্থায়ী বাসস্থানের উপর পর্যবেক্ষণ করেছি ও জরিপ চালিয়েছি। জরিপের সুবিধার্থে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি থেকে ১০০ জন করে নেতাকে

Dhaka University Institutional Repository

নমুনা হিসাবে গ্রহণ করে তাদের স্থায়ী বাসস্থানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তার উপর জরিপ (শতকরা হার অনুসারে) পরিচালনা করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল নিম্নে সারণীবদ্ধভাবে দেওয়া হল ঃ

সারণী ৫.৪

উদীয়মান নেতাদের স্থায়ী বাসস্থান– শতকরা হার

দলের নাম	গ্রাম	উপজেলা সদর	জেলা সদর	রাজধানী বাদে মেট্রোপলিটন এলাকা	রাজধানী
আওয়ামী লীগ	৩৮%	১৭%	২৫%	৬%	১৪%
বিএনপি	৪৩%	২৩%	১৯%	৩%	১২%

উপরোক্ত সারণী থেকে দেখা যায় যে, উদীয়মান নেতৃবৃন্দের একটা বড় অংশ গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাদের (উদীয়মান নেতাদের) ব্যক্তিগত তথ্য অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, যেসব নেতাদের স্থায়ী বাসস্থান গ্রাম, তাদের অনেকে আবার বছরের পর বছর ধরে শহরে বিশেষ করে রাজধানীতে অস্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, তাহলো– গণতান্ত্রিক রাজনীতির লক্ষ্য যেখানে নির্বাচন, উদীয়মান নেতাদের ক্ষেত্রে এই নির্বাচন প্রবণতা আরো বেশী। তাই তাঁরা তাদের স্থায়ী বাসস্থান কেন্দ্রিক নির্বাচনী এলাকাকে খুবই গুরুত্বের সাথে নেন এবং নিয়মিত এলাকার সাথে যোগাযোগ রাখেন, এবং এলাকাবাসীকে রাজনীতিতে উৎসাহী করতে তৎপর হন। রাজনৈতিক কর্মসূচী পরিচালনা করতে গিয়ে নেতারা জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলেন।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের স্থায়ী বাসস্থান, তাদের রাজনৈতিক জীবনকে কতটুকু প্রভাবিত করছে, এ সম্পর্কে জরিপভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

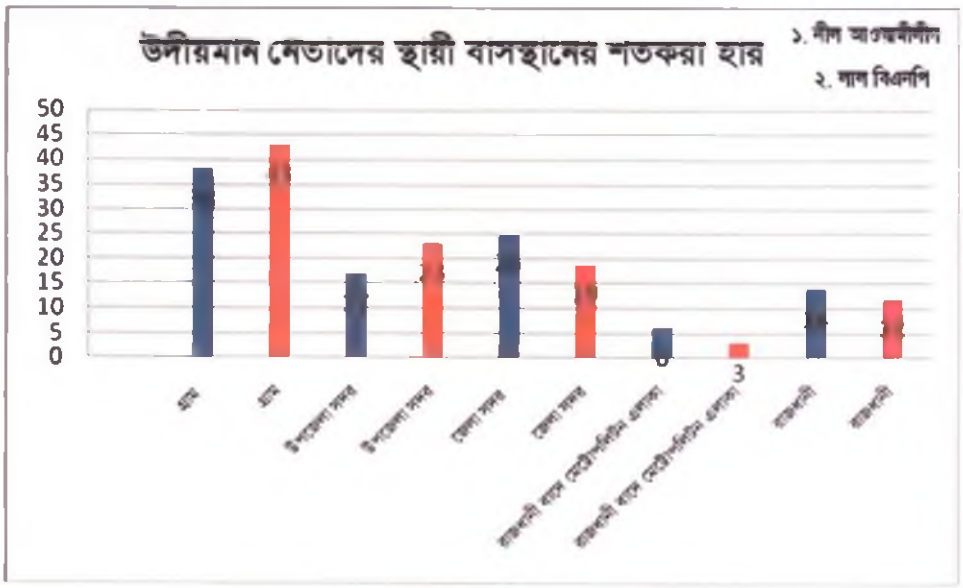

৫.৫.২ আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের স্থায়ী বাসস্থান সম্পর্কে বিশ্লেষণ ঃ আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের ৩৮% স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস করেন। অর্থাৎ ৩৮% এর স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম। এটা উদীয়মান নেতৃবৃন্দের স্থায়ী আবাসনের সর্বোচ্চ শতকরা হার। আবার উপজেলা সদর ও জেলা সদরের মধ্যে দেখা যায় যে, উপজেলা সদরের চেয়ে জেলা সদরে স্থায়ীভাবে বেশী নেতা বসবাস করেন। যেমন– শতকরা ১৭ জন উপজেলা সদরে বসবাস করেন এবং জেলা সদরে শতকরা ২৫ জন নেতা বাস করেন। এই অসঙ্গতি মেট্রোপলিটন শহর ও রাজধানীতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নেতাদের মধ্যেও দেখা যায়। যেমন– শতকরা ১৪ জন নেতা রাজধানীতে বসবাস করেন। অপরদিকে রাজধানী বাদে মেট্রোপলিটন এলাকায় বসবাসকারী নেতার শতকরা হার ৬ জন।

যেহেতু দেখা যাচ্ছে যে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৩৮%) নেতা গ্রামে বাস করেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে গ্রামই রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু তথ্য পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, যাদের (৩৮%) স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম কিন্তু তাদের মধ্যে আবার ৩২%-ই অস্থায়ীভাবে রাজধানীতে বসবাস করেন। রাজধানীতে বসবাসের কারণ হিসাবে দেখা যায় প্রধানত জীবিকা নির্বাহ এবং কেন্দ্রীয় রাজনীতির কাছাকাছি থাকা। গবেষণায় আরো দেখা যায় যে, এই ৩২% নেতা যারা রাজধানীতে বসবাস করেন তাদের মধ্যে ১৭%-ই

Dhaka University Institutional Repository

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী (সামরিক ও বেসামরিক) আমলা। বাকি ১৫% নেতার মধ্যে অধিকাংশ ব্যবসায়ী; কিছু আছেন বেসরকারী চাকুরীজীবী। এই ৩২% নেতা যারা অস্থায়ীভাবে রাজধানীতে বসবাস করেন তারা রাজধানী কেন্দ্রীক রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। অস্থায়ী ভিত্তিতে রাজধানীতে বসবাসকারী গ্রামীণ (যাদের স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম) নেতাদের (৩২%) উপর জরিপভিত্তিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, এদের মধ্যে ১৮% নেতাই নিয়মিতভাবে গ্রামের সাথে যোগাযোগ রাখেন না। শুধুমাত্র, রাজনৈতিক কর্মসূচীর প্রয়োজনে গ্রামে যান। তবে ক্ষমতাসীন হতে পারলে (নির্বাচনে জয়যুক্ত হলে) তখন তারা নিয়মিতভাবে নির্বাচনী এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন এবং এর উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন মাত্র ৬% নেতা। এরা গ্রামভিত্তিক বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত। অনুরূপভাবে, উপজেলা সদরে বসবাসকারী ১৭% নেতার মধ্যে পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ৬% নেতা বর্তমানে রাজধানীতে বসবাস করেন এবং তাঁরা ঢাকা কেন্দ্রীক রাজনীতির সাথে সংযুক্ত। বাকি ১১% নেতার মধ্যে ৮%-এর বাসস্থান এমন উপজেলায় যেগুলি পৌরসভার অন্তর্গত। এই পৌর (৮%) নেতারা নিজস্ব এলাকায় দলীয় কর্মকান্ডে খুবই সক্রিয়।

অপরপক্ষে, জেলা সদরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন ২৫% নেতা। এই ২৫%-এর মধ্যে ৩% বর্তমানে ঢাকায় বসবাস করেন। বাকি ২২% নেতা স্থায়ীভাবে জেলা সদরে বসবাস করেন। গবেষণা পর্যবেক্ষণে আরো বেরিয়ে এসেছে যে, এইসব জেলা নেতারা (যারা স্থায়ীভাবে জেলা সদরে বসবাস করেন) আঞ্চলিক রাজনৈতিক উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

449250

মেট্রোপলিটন এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী (৬%) নেতাদের মধ্যে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, যিনি অস্থায়ী ভিত্তিতে ঢাকায় বসবাস করেন। মেট্রোপলিটন নেতাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট স্বচ্ছল এবং ব্যক্তি হিসাবে সু-পরিচিত।

উল্লেখ্য যে, ১০০ জন উদীয়মান নেতার মধ্যে ৫৭ জন নেতা স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে রাজধানীতে বসবাস করেন। এদের মধ্যে স্থায়ীভাবে ঢাকায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বসবাস করেন ১৪% এবং অস্থায়ীভাবে বাস করেন ৪৩% নেতা। আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের শতকরা ৫৭ জন নেতা রাজধানীতে বসবাসের কারণে নিয়মিতভাবে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা বাদে দেশের অন্যান্য স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নেতাদের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ৩৮% গ্রামীণ (যারা স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস করেন) নেতাদের মধ্যে ৩২% ঢাকায় অস্থায়ীভাবে বাস করেন। বাকি ৬% নেতা স্থায়ীভাবে গ্রামে বাস করেন। ১৭% উপজেলা সদর (যারা উপজেলা সদরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন) নেতাদের ভিতর ৮% অস্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস করেন। বাকি ৯% নেতা স্থায়ীভাবে উপজেলা সদরে বসবাস করেন। ২৫% জেলা সদর (যারা জেলা সদরে স্থায়ীভাবে বাস করেন) নেতাদের মধ্যে ৩% নেতা অস্থায়ীভাবে ঢাকায় বাস করেন। বাকি ২২% নেতা তাদের একমাত্র আবাসস্থল জেলা সদরে বাস করেন। রাজধানী বাদে মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ৬% নেতার সবাই স্থায়ী বাসস্থানে বাস করেন। রাজধানী বাদে স্থায়ী ঠিকানা বা বাসস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নেতাদের মোট শতকরা হার হচ্ছে (গ্রামে বসবাসকারী ৬%, উপজেলা সদরে বসবাসকারী ৯%, জেলা সদরে বসবাসকারী ২২%, রাজধানী বাদে মেট্রোপলিটন এলাকায় বসবাসকারী ৬%) ৪৩।

এই গবেষণা পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে, সমগ্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে পরিমান নেতা বাস করেন, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক নেতা ঢাকায় বা রাজধানীতে বসবাস করেন। অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষণ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বর্তমান সময়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতি রাজধানী কেন্দ্রীক হয়ে উঠছে। তবে রাজধানীতে বসবাসকারী বহিরাগত-৪৩% নেতাদের ব্যক্তিগত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, রাজধানীতে বসবাস করলেও ৪০% সরাসরি কৃষি থেকে আয় গ্রহণ করেন। এ থেকে বলা যায় যে, রাজধানীতে বাস করে কেন্দ্রিয় রাজনীতিতে সক্রিয় থাকলেও এসব নেতারা (অস্থায়ী ভাবে ঢাকায় বাস করেন), মাটির সঙ্গে (Grass root) সম্পর্ক ছিন্ন করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫.৩ বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের স্থায়ী বাসস্থান সম্পর্কে বিশ্লেষণ ঃ

বিএনপি'র ১০০ জন উদীয়মান নেতার স্থায়ী বাসস্থানের উপর জরিপ করে দেখা যায় যে, শতকরা ৪৩ জন নেতার স্থায়ী নিবাস গ্রাম। অপরদিকে শতকরা ২৩ জন উপজেলা সদরে এবং শতকরা ১৯ জন নেতা জেলা সদরে বাস করেন। রাজধানী বাদে মেট্রোপলিটন এলাকায় বাস করেন শতকরা ৩ জন নেতা এবং রাজধানীতে স্থায়ীভাবে বাস করেন ১২ জন নেতা।

উপরোক্ত জরিপের ফলাফল থেকে মনে হতে পারে, বিএনপি'র অধিকাংশ নেতা গ্রামে বাস করেন। কিন্তু উদীয়মান নেতাদের ব্যক্তিগত তথ্য অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ৪৩% গ্রামীণ (যারা স্থায়ীভাবে গ্রামে বাস করেন বা যাদের স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম) নেতাদের ৩৯% নেতাই দ্বিতীয় বাসস্থান বা অস্থায়ী ভিত্তিতে রাজধানীতে বসবাস করেন। রাজধানীতে যেসব গ্রামীণ (৩৯%) নেতা বসবাস করেন তাদের মধ্যে ২৭% নেতা ব্যবসায়ী এবং ৯% সরকারী আমলা (সামরিক ও বেসামরিক) এবং ৩% পেশাজীবী (যেমন– ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, বেসরকারী চাকুরীজীবী ইত্যাদি)। এই ৩৯% গ্রামীণ (গ্রাম যাদের স্থায়ী বাসস্থান) নেতারা, যারা অস্থায়ীভাবে রাজধানীতে বসবাস করেন, তাঁরা রাজধানী কেন্দ্রীক বিএনপি'র সব ধরনের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন, এবং কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে খুবই সক্রিয় থাকেন। তবে এদের মধ্যে ১৯% নেতা তাদের স্থায়ী বাসস্থানের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন এবং স্থানীয় বা আঞ্চলিক রাজনীতিতে সমভাবে সক্রিয় থাকেন। বাকি ২০% নেতা যারা স্থায়ী বাসস্থানের (গ্রাম) সাথে যোগাযোগ রাখেন না এবং আঞ্চলিক রাজনীতিতেও নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেন না কিন্তু নিজস্ব অঞ্চলে প্রভাব বজায় রাখেন এসব নেতাদের উপর গবেষণায় দেখা যায় যে, এদের রাজনীতি মূলত নির্বাচনমুখী। এরা নির্বাচনে জয়যুক্ত হতে পারলে নির্বাচনী এলাকার উন্নয়নে মনোযোগী হয়ে ওঠেন।

১০০ উদীয়মান নেতার মধ্যে ৪৩ জনের স্থায়ী নিবাস গ্রাম। এদের মধ্যে ৩৯ জন রাজধানীতে অস্থায়ী ভিত্তিতে বসবাস করেন। বাকি ৪ জন নেতা স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস করেন। অর্থাৎ এদের কোন অস্থায়ী বা বিকল্প বাসস্থান নেই। পর্যবেক্ষণে আরো দেখা যায় যে, এরা গ্রামভিত্তিক বিভিন্ন পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

তার মধ্যে অন্যতম কৃষি। এই ৪% গ্রামীণ নেতা যারা স্থায়ীভাবে গ্রামে বাস করেন, তারাই মূলত গ্রামীণ রাজনীতির কান্ডারী। এরা গ্রামের রাজনীতিকে বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে সক্রিয় রাখেন।

উপজেলা সদরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন শতকরা ২৩ জন নেতা। গবেষণায় দেখা যায় যে, এই ২৩% নেতার মধ্যে ১৫% নেতা অস্থায়ী ভিত্তিতে ঢাকায় বা রাজধানীতে বসবাস করেন। বাকি ৮% নেতার মধ্যে ৭% নেতা যেসব উপজেলা সদরে বসবাস করেন, সেসব উপজেলা সদর পৌরসভার অধীন। এসব পৌর এলাকায় আঞ্চলিক রাজনীতি খুবই জোড়ালো থাকে বিধায় নেতারাও সক্রিয় থাকেন। আবার জেলা সদরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন শতকরা ১৯ জন নেতা। উপজেলা সদরে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নেতাদের তুলনায় জেলা সদরে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নেতাদের সংখ্যা কম হলেও জেলা সদরে বসবাসকারী নেতাদের মধ্যে ৪% নেতা অস্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস করেন। বাকি ১৫% নেতা স্থায়ীভাবে এবং একক বাসস্থান হিসাবে জেলা সদরে বাস করে থাকেন এবং এ সমস্ত জেলা সদর (যাদের স্থায়ী বাসস্থান জেলা সদর) নেতারা নিজ এলাকায় খুবই প্রভাবশালী। শুধু তাই নয়, এরা সমগ্র জেলার রাজনীতিতে সক্রিয় ভুমিকা পালনের মাধ্যমে জেলা তথা আঞ্চলিক রাজনীতিকে সচল রাখেন।

রাজধানী বাদে মেট্রোপলিটন এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নেতাদের শতকরা হার ৩। রাজধানী বাদে মেট্রোপলিটন এলাকার নেতাদের সংখ্যা গ্রাম নেতা (গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী), উপজেলা নেতা (উপজেলা সদরে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী), জেলা নেতাদের (জেলা সদরে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী) তুলনায় নিতান্তই কম। তবে এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা নিজস্ব এলাকায় সু-পরিচিত ব্যক্তি, অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল এবং উচ্চশিক্ষিত। রাজধানী বাদে মেট্রোপলিটন এলাকার নেতাদের আরো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এদের মধ্যে এমন কাউকে পাওয়া যায়নি যিনি অস্থায়ীভাবে রাজধানী বা অন্য কোথাও বসবাস করেন।

Dhaka University Institutional Repository

আবার, রাজধানীতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নেতাদের শতকরা হার ১২। এই ১২% নেতার মধ্যে কেউই অস্থায়ীভাবে বা দ্বিতীয় বাসস্থান হিসাবে অন্য কোথাও বসবাস করেন না। কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, রাজধানীতে কর্মের সুযোগ যেমন বেশী, নাগরিক সুবিধাদিও বেশী, তেমন কেন্দ্রীয় রাজনীতির কেন্দ্র স্থলও রাজধানী। সংগত কারণে রাজধানীর স্থায়ী বাসিন্দা নেতাদের অন্যত্র যাওয়ার অভিপ্রায় থাকেনা। তবে, রাজধানীতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী উদীয়মান (১২%) নেতারা অত্যন্ত প্রভাবশালী। তবে, অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী নেতারাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। গবেষণা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, রাজধানীতে অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী নেতাদের হার হচ্ছে ৫৮%।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী (১২%) নেতাদের পাঁচগুণ (৫৮%) নেতা অস্থায়ীভাবে রাজধানীতে বাস করেন। অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী নেতাদের ব্যক্তিগত তথ্য পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ৫৮% নেতাদের মধ্যে ৪২% নেতাই বিভিন্নভাবে ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। বাকি ১৬% নেতার মধ্যে ৯% অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলা। বাকি ৭%-এর মধ্যে আছেন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, শিক্ষক, বেসরকারী চাকুরীজীবী ইত্যাদি। তবে এদের মধ্যে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি যিনি পেশাদার রাজনীতিবিদ।

বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের মধ্যে যারা অস্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস করেন (৫৮%), তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর জরিপ চালিয়ে দেখা যায় যে, এরা রাজধানী কেন্দ্রীক রাজনীতিতে যেমন সক্রিয় থাকেন, তেমনি আঞ্চলিক বা স্থানীয় রাজনীতিতে প্রভাবশালী হয়ে থাকেন। যদিও এই ৫৮% নেতার মধ্যে ২৮% কে পাওয়া যায় যারা নিয়মিতভাবে আঞ্চলিক বা স্থানীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন না। বাকি ৩০% নেতা নিয়মিতভাবে আঞ্চলিক রাজনৈতিক কর্মকান্ডের খোঁজ খবর রাখেন এবং আঞ্চলিক রাজনীতিকে উৎসাহিত করেন।

গবেষণা পর্যবেক্ষণে ঢাকা বাদে দেশের অন্যান্য স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নেতাদের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৪৩% গ্রাম (যারা স্থায়ীভাবে গ্রামে বাস করেন) নেতাদের মধ্যে ৩৯% নেতা অস্থায়ীভাবে ঢাকায় বাস করেন। বাকি ৪% নেতা স্থায়ীভাবে গ্রামে বাস করেন।

Dhaka University Institutional Repository

২৩% উপজেলা সদর (যাদের স্থায়ী নিবাস উপজেলা সদর) নেতাদের মধ্যে ১৫% নেতা অস্থায়ীভাবে রাজধানীতে বসবাস করেন। বাকি ৮% নেতা স্থায়ীভাবে উপজেলা সদরে বসবাস করেন।

১৯% জেলা সদর (যারা জেলা সদরে স্থায়ীভাবে বাস করেন) নেতাদের মধ্যে ৪% অস্থায়ী বা দ্বিতীয় বাসস্থান হিসাবে রাজধানীতে বসবাস করেন। বাকি ১৫% নেতা স্থায়ীভাবে জেলা সদরে বাস করেন, আর কোন বিকল্প বাসস্থানে বাস করেন না। ৩% রাজধানী বাদে মেট্রোপলিটন এলাকার নেতাদের মধ্যে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি যিনি অস্থায়ীভাবে রাজধানী বা অন্য কোথাও বসবাস করেন।

রাজধানী বাদে স্থায়ী ঠিকানায় বা স্থায়ী বাসস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নেতাদের মোট শতকরা হার হচ্ছে (গ্রামে বসবাসকারী ৪%, উপজেলা সদরে বসবাসকারী ৮%, জেলা সদরে বসবাসকারী ১৫%, ঢাকা বাদে মেট্রোপলিটন এলাকায় বসবাসকারী ৩%) ৩০।

অতত্রব, উপরোক্ত ফলাফল থেকে বলা যায যে, যে পরিমান নেতা (৩০%) সমগ্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করেন, তার প্রায় আড়াই গুণ (৭০%) নেতা রাজধানীতে বসবাস করেন। এ থেকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, বিএনপি'র রাজনীতি রাজধানী কেন্দ্রীক। তবে, রাজধানীতে বসবাসকারী বহিরাগত (অস্থায়ী) ৫৮%-এর ব্যক্তিগত তথ্য অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ৪৮% নেতা সরাসরি কৃষি থেকে আয় উপার্জন করেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাজধানীতে বসবাসকারী নেতারা কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি তাদের শেকড়ের সাথে নিয়মিতভাবে হোক আর অনিয়মিতভাবে হোক সম্পর্ক ধরে রেখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫.৪ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের স্থায়ী বাসস্থানের উপর তুলনামূলক বিশ্লেষণ ঃ

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের স্থায়ী বাসস্থানের উপর জরিপ করে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগের ৩৮% নেতা গ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করেন। যদিও ৩৮% নেতার মধ্যে ৩২% কে পাওয়া যায় যারা অস্থায়ীভাবে রাজধানীতে বসবাস করেন।

অপরদিকে, বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের মধ্যে ৪৩% নেতা গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এই ৪৩% নেতার মধ্যে আবার ৩৯% অস্থায়ী ভিত্তিতে রাজধানীতে বসবাস করেন। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাসকারীদের শতকরা হার আওয়ামী লীগের তুলনায় বিএনপি'তে যেমন বেশী, তেমনি অস্থায়ী ভিত্তিতে ঢাকায় বসবাসকারী নেতাদের শতকরা হারও তুলনামূলকভাবে বেশী। তবে উভয় দলের গ্রামে স্থায়ী বসবাসকারী নেতাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রাজধানীতে যারা অস্থায়ীভাবে বসবাস করেন, তারা কেন্দ্রীয় রাজনীতির সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্ক রাখেন এবং কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় রাজনীতি চর্চার সঙ্গে সঙ্গে এরা আঞ্চলিক রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। তবে, এদের অনেকেই আঞ্চলিক রাজনীতির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন না। জরিপ গবেষণায় দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগের ৩২% গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নেতা, যারা অস্থায়ী অথবা বর্তমানে দ্বিতীয় বাসস্থান হিসেবে রাজধানীতে বসবাস করছেন, তাদের মধ্যে ১৫%-ই গ্রামের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন না। একইভাবে, বিএনপি'তেও ৩৯% গ্রামে স্থায়ী বসবাসকারী নেতা যারা অস্থায়ীভাবে অথবা বর্তমানে দ্বিতীয় বাসস্থান হিসেবে রাজধানীতে বসবাস করছেন, তাদের মধ্যে ১৯% নেতাই নিয়মিতভাবে গ্রামের সাথে যোগাযোগ রাখেন না।

উপজেলা সদরে বসবাসকারী নেতাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগের উদীয়মান ১০০ জন নেতার মধ্যে ১৭ জন উপজেলা সদরে বসবাস করেন। এই ১৭% এর মধ্যেও আবার ৬% অস্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস করেন। অপরদিকে, বিএনপি'তে উপজেলা সদরে বসবাসকারী নেতাদের শতকরা হার

Dhaka University Institutional Repository

২৩। এই ২৩% এর মধ্যে ১৫%-ই অস্থায়ীভাবে বা বিকল্প বাসস্থান হিসাবে ঢাকায় বসবাস করেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আওয়ামী লীগের তুলনায় বিএনপি'তে উপজেলা সদরে বসবাসকারী নেতার সংখ্যা যেমন বেশী, তেমনই রাজধানীতে বসবাসকারী নেতার সংখ্যাও বেশী।

অন্যদিকে, জেলা সদরে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী উদীয়মান আওয়ামী লীগ নেতাদের শতকরা হার ২৫, যাদের মধ্যে মাত্র ৩ জন অস্থায়ীভাবে রাজধানীতে বসবাস করেন। কিন্তু জেলা সদরে বসবাসকারী নেতার শতকরা হার মাত্র ১৯। এই ১৯%-এর মধ্যে মাত্র ৩% অস্থায়ী ভিত্তিতে রাজধানীতে বসবাস করেন। তবে উভয় দলেই জেলা সদরে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নেতাদের খুবই কম সংখ্যক ঢাকায় অস্থায়ীভাবে বসবাস করেন। যেখানে গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নেতাদের অধিকাংশই অস্থায়ীভাবে রাজধানীতে থাকেন। উপজেলা সদরে বসবাসকারী নেতাদের প্রায় অর্ধেক নেতা অস্থায়ীভাবে ঢাকায় থাকেন, সেখানে জেলা সদরে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নেতাদের মধ্যে ১/৪ অংশেরও কম নেতা রাজধানীতে থাকেন। অনুরূপভাবে রাজধানীবাদে মেট্রোপলিটন এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নেতাদের শতকরা হার আওয়ামী লীগে ৬ এবং বিএনপি'তে ৩। কিন্তু উভয় দলেই এই সীমিত সংখ্যক নেতার মধ্যে কেউই অস্থায়ীভাবে ঢাকায় বা অন্য কোথাও বসবাস করেন না।

আবার, রাজধানীতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের শতকরা হার ১৪ এবং বিএনপি'র উদীয়মান নেতার শতকরা হার ১২। উভয় দলের রাজধানীর স্থায়ী বাসিন্দা নেতাদের কোন দ্বিতীয় বা বিকল্প বাসস্থান নেই।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আমাদের দেশের বেশীর ভাগ উদীয়মান নেতার স্থায়ী নিবাস গ্রাম কিন্তু তাদের বেশির ভাগই অস্থায়ী ভিত্তিতে শহরে বিশেষ করে রাজধানীতে বসবাস করেন। তবে, এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, গ্রাম থেকে শহুরে নেতাদের অস্থায়ী ভিত্তিতে রাজধানী বা অন্য কোথাও বসবাসের প্রবণতা কমে আসছে। যেমন-অস্থায়ী ভিত্তিতে রাজধানীতে বসবাসকারী নেতাদের মধ্যে গ্রাম থেকে উপজেলা সদরে বসবাসকারীর সংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

কম, একইভাবে জেলা সদরে আরো কম, এবং রাজধানী বাদে মেট্রোপলিটন এলাকায় অস্থায়ী ভিত্তিতে বসবাসকারীর সংখ্যা শূণ্য। রাজধানীর স্থায়ীবাসী নেতাদের মধ্যেও কেউ নেই, যিনি অন্য কোথাও অস্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, রাজনীতি এখন শহর কেন্দ্রীক। তাই শহুরে নেতাদের স্থানান্তরিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও প্রবণতা কম। এ অবস্থা আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। তবে নেতাদের সংখ্যাগত উপস্থিতির সামান্য তারতম্য আছে। দেখা যাচ্ছে যে, আওয়ামী লীগের যে পরিমান নেতা স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস করেন, তার তিন গুণ নেতা অস্থায়ীভাবে রাজধানীতে বসবাস করেন। রাজধানীতে বর্তমানে বসবাসকারী উদীয়মান আওয়ামী লীগ নেতাদের শতকরা হার ৫৭, এর মধ্যে স্থায়ী বসবাসকারীর সংখ্যা ১৪ ও অস্থায়ী বসবাসকারীর সংখ্যা ৪৩।

আবার বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের ১০০ জনের মধ্যে ১২ জন স্থায়ীভাবে রাজধানীতে বসবাস করেন। আর অস্থায়ীভাবে বসবাস করেন ৫৮ জন।

বিএনপি'তে যে পরিমান নেতা স্থায়ীভাবে বসবাস করেন, তার প্রায় পাঁচগুণ নেতা অস্থায়ীভাবে রাজধানীতে বসবাস করেন। রাজধানীতে বর্তমানে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের শতকরা হার ৭০। এর মধ্যে স্থায়ী বসবাসকারীর সংখ্যা ১২ ও অস্থায়ী বসবাসকারীর সংখ্যা ৫৮।

উপরোক্ত জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সাম্প্রতিক বাংলাদেশের রাজনীতি শুধু শহর কেন্দ্রীকই নয়, রাজধানী কেন্দ্রীকও বটে। উভয় দলের নেতাদের বাসস্থানের উপর গবেষণা করতে গিয়ে চলমান রাজনৈতিক ধারায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র নেতাদের অবস্থানগত দিক দিয়ে অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু রাজধানী কেন্দ্রীক রাজনীতিতে উভয় দলের নেতাদের সংখ্যাগত অবস্থানের পার্থক্য লক্ষণীয় মাত্রায় বেশী। যেমন- রাজধানীতে বসবাসকারী আওয়ামী লীগ নেতাদের শতকরা হার ৫৮, এবং বিএনপি'র ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণায় আরো দেখা গেছে যে, বিএনপি'র নেতারা যদিও আওয়ামী লীগের নেতাদের থেকে বেশী রাজধানী কেন্দ্রীক, তারপরও বিএনপি'র রাজধানী কেন্দ্রীক নেতাদের ৪৮% সরাসরি কৃষি থেকে আয় গ্রহণ করেন। আর, আওয়ামী লীগের ৫৭% রাজধানীবাসী উদীয়মান নেতাদের মধ্যে ৪০% কৃষি থেকে আয় গ্রহণ করেন।

অবশেষে বলা যায় যে, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের মধ্যে শহুরে রাজনীতির প্রবণতা বেশী। এই শহুরে প্রবণতার মধ্যে আবার কেন্দ্রীয় রাজনীতির প্রতি ঝোঁক খুবই বেশী।

৫.৬ বয়স ঃ

বয়স জীবনের মৌলিক উপাদান। প্রতিটি কাজের জন্য বয়সের স্তর বিন্যাস রয়েছে। যেমন– শৈশবে হেসে খেলে বেড়ানো, কৈশরে পাঠ গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু এবং তা চলে তারুণ্যের প্রথম ধাপ পর্যন্ত। মধ্য তরুণ থেকে কর্মজীবন শুরু হয় এবং চলে মধ্য বয়স পর্যন্ত। এটা হচ্ছে বয়সের স্বাভাবিক গতি। এর যে ব্যতিক্রম হয় না, তা নয়। যেখানে প্রতিটি কর্মযজ্ঞের জন্য বয়স অপরিহার্য, সেখানে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য বয়স অবধারিতভাবে অর্থবহ। যদিও রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের জন্য নূন্যতম বা সর্বোচ্চ বয়স সীমার কোন উল্লেখ নেই। তাই এখানে বিভিন্ন বয়সের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। যদিও নির্বাচনের জন্য সর্বনিম্ন বয়সসীমা ২৫ বছর এবং সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে কোন বিধিবদ্ধ সীমা নেই।

৫.৬.১ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের বয়স সম্পর্কে আলোচনা ঃ

রাজনৈতিক নেতাদের বয়সের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। উদীয়মান রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রেও তা সমভাবে প্রযোজ্য। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের মধ্যে বিভিন্ন বয়সী নেতা থাকলেও বিশেষ বয়সের (৪০ থেকে ৬০) অবস্থানই বেশি। এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, কেন এই (৪০ থেকে ৬০ বছর) বয়সের উদীয়মান নেতাদের রাজনীতিতে সংখ্যাধিক্য বা কেন তারা প্রভাবশালী? ৪০ থেকে ৬০ বছরের উদীয়মান

Dhaka University Institutional Repository

নেতাদের রাজনীতিতে সংখ্যাধিক্য এবং দলের মধ্যে প্রভাবশালী হওয়ার কারণ হল তাঁরা অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এবং রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের মত গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য যে শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা থাকা দরকার, তা তাদের থাকে। এর অর্থ এই নয় যে ৪০ থেকে ৬০ বছরের নিম্ন বা উর্ধ্ব বয়স্ক কেউ দলকে নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হন না। আরো বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে রাজনৈতিক দলের নেতা হতে গেলে যে সমস্ত গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে– ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা, প্রভাবিত করার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা। এসব গুণাবলীর কিছু কিছু জন্মগত হলেও বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা পরিপক্কতা পায়। আবার দেখা যায় যে, বয়স যখন বেশী (৬০ উর্ধ্ব) হয়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবে শারীরিক দূর্বলতা, মানসিক অবসাদগ্রস্থতার কারণে মানুষের কার্যক্ষমতা লোপ পায়। গবেষণা পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, বুদ্ধিগত অবস্থানের পরিণত অবস্থায় আসতে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে পৌছাতে যে সময়টা (বয়স) লাগে তা ৪০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। আর ৬০ বছর পার হলে দেখা যায় যে, মানুষের সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থানের কোন হেরফের না হলেও ব্যর্ধক্যজনিত সমস্যায় শারীরিক, মানসিক অবসাদ চলে আসে। তাই অনেকেরই এই বয়সে নেতৃত্বের আগ্রহ কমে যায়।

গবেষণার প্রয়োজনে আওয়ামী লীগের ১০০ জন ও বিএনপি'র ১০০ জন বিভিন্ন বয়সের নেতাদের বয়সকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তার উপর জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল সারণীবদ্ধভাবে নিম্নরূপে প্রদত্ত হলঃ

সারণী ৫.৫

উদীয়মান নেতাদের বয়সের শতকরা হার

দলের নাম	২৫-৩৪ বছর পর্যন্ত	৩৫-৪৫ বছর পর্যন্ত	৪৬-৫৫ বছর পর্যন্ত	৫৬-৬৫ বছর পর্যন্ত	৬৫ উর্ধ্বে
আওয়ামী লীগ	৭%	২০%	৪১%	২৭%	৫%
বিএনপি	৮%	২২%	৪০%	২৫%	৬%

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলেই মধ্য বয়স্ক (৪৫-৫৫ পর্যন্ত) নেতাদের সংখ্যা ও প্রভাব দুই-ই বেশী।

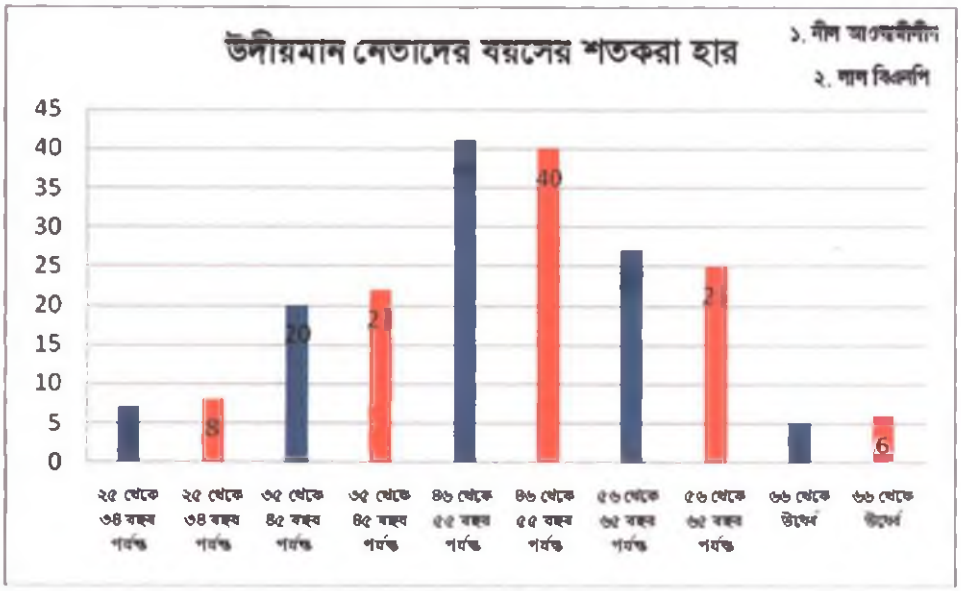

বয়স জীবনকে যেমন কয়েকটি কর্মস্তরে ভাগ করে দেয় তেমনই কর্ম অনুপ্রেরণা যোগায়। তাই সাম্প্রতিক সময়ের আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের বয়সের উপর জরিপভিত্তিক বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ।

৫.৬.২ আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের বয়সভিত্তিক জরিপ বিশ্লেষণ ঃ

আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের মধ্যে যাদের বয়স ২৫-৩৪ বছরের মধ্যে তাদের শতকরা হার ৭, যাদের বয়স ৩৫-৪৫ বছরের মধ্যে তাদের শতকরা হার ২০, যাদের বয়স ৪৬-৫৫ বছরের মধ্যে তাদের শতকরা হার ৪১ জন। যাদের বয়স ৫৬-৬৫ বছরের মধ্যে, তাদের শতকরা হার ২৭। যাদের বয়স ৬৫ উর্ধ্বে তাদের শতকরা হার ৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত জরিপের ফলাফলকে কয়েকটি নামে নামকরণ পূর্বক জরিপ বিশ্লেষণে অগ্রবর্তি হয়েছি। যেমন–

২৫-৩৪ বছর পর্যন্ত ঃ তরুণ

৩৫-৪৫ বছর পর্যন্ত ঃ প্রান্তিক তরুণ

৪৬-৫৫ বছর পর্যন্ত ঃ মধ্য বয়স

৫৬-৬৫ বছর পর্যন্ত ঃ প্রারম্ভিক প্রবীণ

৬৫ উর্ধ্বে ঃ প্রবীণ

এগুলোর বাস্তব সম্মত কোন ভিত্তি নেই। বিষয় বিশ্লেষণের সুবিধার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

এখন দেখা যাচ্ছে তরুণ নেতাদের (৭%) ও প্রবীণ নেতাদের (৫%) সংখ্যা খুবই সীমিত। আবার, প্রান্তিক তরুণ নেতাদের (২০%) ও প্রারম্ভিক প্রবীণ নেতারা (২৭%) সংখ্যাগত ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় আছেন। কিন্তু মধ্য বয়স্ক নেতারা সংখ্যাগতভাবে (৪১%) দলের মধ্যে খুবই শক্তিশালী।

অনুসন্ধানে আরো জানা যায় যে, এই মধ্য বয়স্ক নেতার সংখ্যা যেমন দলে বেশী, তেমনি এদের প্রভাবও বেশী এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ এরাই বেশী পান। এর কারণ হিসাবে দেখা যায়, মানসিক, শারীরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থানের দিক দিয়ে মধ্য বয়স্ক নেতারা খুবই স্থিতিশীল অবস্থায় থাকেন।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, মধ্যবয়স্ক নেতাদের প্রতি রাজনৈতিক দলেরও আগ্রহ বেশী থাকে। কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, উদীয়মান নেতাদের রাজনৈতিক সামাজিক পিছুটান কম থাকে, তাঁরা তাদের ব্যক্তি গুণাবলীর যথা- সামাজিক সুপরিচিতি, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, ব্যক্তিত্ব দ্বারা দলের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে দলীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এসব গুণাবলী অর্জনে যথেষ্ট সময় লাগে। তাই উদীয়মান নেতাদের ভিতর তরুণ নেতাদের সংখ্যা খুবই কম, মাত্র ৭%। প্রান্তিক তরুণ নেতাদের সংখ্যা তরুণ নেতাদের তুলনায় বেশী, ২০%। কারণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রান্তিক তরুণ নেতারা ব্যক্তিগত গুণাবলী বিকাশের জন্য তরুণ নেতাদের তুলনায় সময় বেশী পান।

আবার, মধ্য বয়স্ক নেতাদের শতকরা হার ৪১, যা দলের মধ্যে তরুণ নেতাদের ছয়গুণ, প্রান্তিক তরুণ নেতাদের চারগুণ। কারণ, আগেও উল্লেখ করা হয়েছে এ বয়সে (মধ্যবয়স) এসে রাজনৈতিক দলের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজনে ব্যক্তিত্ব গঠনে যতটুকু সময় প্রয়োজন তা প্রায়ই পরিপূর্ণ হয়ে থাকে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে, তাহলে কি বয়স যত বৃদ্ধি পাবে, ব্যক্তি নেতৃত্বের জন্য তত উপযুক্ত হবে? কিন্তু গবেষণা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, নেতৃত্বের জন্য ব্যক্তিগত গুণাবলীর যেমন প্রয়োজন, শারীরিক সুস্থতারও প্রয়োজন। আর এজন্যই জরিপে ১০০ জন উদীয়মান নেতার মধ্যে প্রারম্ভিক প্রবীণ নেতা পাওয়া যায় মাত্র ২৭ জন। কারণ, এই বয়সে (প্রারম্ভিক প্রবীণ) এসে অনেকেই সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও শারীরিকভাবে সুস্থ না থাকায় রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের প্রতি আগ্রহী কম থাকেন।

ঠিক একই কারণে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক অক্ষমতা প্রবল হয়, তাই প্রবীণ নেতাদের সংখ্যা মাত্র ৫%।

অতএব, সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের মধ্যে মধ্য বয়স্ক (যাদের বয়স ৪৬-৫৫ বছরের মধ্যে) নেতাদের প্রভাব সবচেয়ে বেশী।

৫.৬.৩ বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের বয়স সংক্রান্ত বিশ্লেষণ ঃ

বিএনপি'র উদীয়মান বিভিন্ন বয়সের নেতাদের বয়সকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে, তার উপর জরিপ করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণের সুবিধার্থে বয়স সীমাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-

Dhaka University Institutional Repository

১/ তরুণ নেতা (২৫-৩৪ বছর পর্যন্ত)

২/ প্রান্তিক তরুণ নেতা (৩৫-৪৫ বছর পর্যন্ত)

৩/ মধ্য বয়স্ক নেতা (৪৬-৫৫ বছর পর্যন্ত)

৪/ প্রারম্ভিক প্রবীণ নেতা (৫৬-৬৫ বছর পর্যন্ত)

৫/ প্রবীণ নেতা (৬৬-উর্ধ্বে)

যদিও এই শ্রেণী বিভাগের কোন বাস্তব সম্মত ভিত্তি নেই, শুধুমাত্র বিষয় বিশ্লেষণের সুবিধার্থে বয়সের এ বিভাজন করা হয়েছে। জরিপের ফলাফলে দেখা যায় যে, বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের মধ্যে তরুণ নেতাদের শতকরা হার ৮ । প্রান্তিক তরুণ নেতাদের শতকরা হার ২২। মধ্য বয়স্ক নেতাদের শতকরা হার ৪০। প্রারম্ভিক প্রবীণ নেতাদের শতকরা হার ২৫। প্রবীণ নেতাদের শতকরা হার ৬।

উপরোক্ত জরিপের ফলাফলে দেখা যায় যে, তরুণ নেতাদের (৮%) ও প্রবীণ নেতাদের (৫%) সংখ্যা দলে খুবই সীমিত। আবার প্রান্তিক তরুণ নেতাদের (২২%) ও প্রারম্ভিক প্রবীণ নেতাদের সংখ্যা (২৫%) দলে ভারসাম্যপূর্ণ। কিন্তু মধ্য বয়স্ক নেতাদের সংখ্যা (৪০%) দলের মধ্যে যেমন বেশী, তেমনি এরা দলের মধ্যে প্রভাবশালী।

অনুসন্ধানে আরো জানা যায় যে, মধ্যবয়স্ক নেতাদের সংখ্যা ও প্রভাব যেমন বেশী, নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগও এরাই বেশী পান। কারণ হিসাবে দেখা যায় যে, শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে মধ্যবয়স্ক নেতারা খুবই শক্তিশালী অবস্থায় থাকেন।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, তরুণ নেতা ও প্রান্তিক তরুণ নেতার মিলিত হার ৩০% ভাগ। প্রারম্ভিক প্রবীণ নেতা ও প্রবীণ নেতার মিলিত হার ৩১% ভাগ। কিন্তু এককভাবে মধ্যবয়স্ক নেতাদের শতকরা হার ৪০। এতে প্রমাণ হয় যে, বিএনপি'তে মধ্যবয়স্ক নেতারা প্রভাবশালী।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে, মধ্যবয়স্ক নেতাদের প্রতি রাজনৈতিক দলেরও আগ্রহ বেশী থাকে। কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায়, যেহেতু উদীয়মান নেতাদের উত্থান ধারাবাহিকভাবে ঘটেনা, সেহেতু তাদের ব্যক্তিগত গুণাবলী যেমন- সামাজিক সুপরিচিতি, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা দ্বারা তাঁরা দলের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে দলীয় নেতৃত্ব লাভের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

গবেষণায় আরো দেখা গেছে যে, ব্যক্তিগত গুণাবলী হঠাৎ করে তৈরী বা বিকশিত হয়না, এর জন্য যথেষ্ট সময় লাগে। যদিও এসব গুণাবলীর মধ্যে কিছু জন্মগত, তবে কিছু আবার অর্জিত। আর এজন্যই উদীয়মান তরুণ নেতাদের শতকরা হার বেশ কম, মাত্র ৭। কারণ ২৫-৩৪ বছরের মধ্যে ব্যক্তিগত গুণাবলী বিকাশের মাধ্যমে দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। আবার প্রান্তিক তরুণ নেতাদের শতকরা হার ২০, যা তরুণ নেতাদের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশী। কারণ ব্যক্তিগত গুণাবলী বিকাশের জন্য যে সময় প্রয়োজন তা প্রান্তিক তরুণ নেতারা তরুণ নেতাদের থেকে বেশী পান। তাই দলের নেতৃত্ব লাভের সুযোগও তাঁরা অধিক প্রাপ্ত হন।

কিন্তু মধ্য বয়স্ক নেতাদের শতকরা হার ৪০, যা তরুণ নেতাদের প্রায় ছয়গুণ, প্রান্তিক তরুণ নেতাদের প্রায় দ্বিগুণ। কারণ উদীয়মান নেতাদের রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব প্রাপ্তির জন্য যে পরিমান ব্যক্তিগত গুণাবলীর প্রয়োজন তা মধ্যবয়সের অধিকাংশ ব্যক্তিদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়ে থাকে।

উপরোক্ত গবেষণা পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হতে পারে যে, রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তি যত বেশী সময় পাবেন, ততই তার ব্যক্তিগত গুণাবলী বিকাশের মাধ্যমে দলের নেতৃত্ব গ্রহণের সুযোগ বেশী পাবেন। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, দলীয় নেতৃত্বের জন্য ব্যক্তিগত গুণাবলীর যেমন প্রয়োজন, শারীরিক, মানসিক সুস্থতা ও সক্ষমতাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জরিপে দেখা যায়, প্রারম্ভিক প্রবীণ নেতাদের শতকরা হার ২৫। কারণ এই বয়সে এসে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনেকে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও শারীরিক-মানসিক সক্ষমতা কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসায় ব্যক্তিগত গুণাবলী

Dhaka University Institutional Repository

পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে অনেকে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের মত প্রতিযোগিতাপূর্ণ পদ গ্রহণে আগ্রহী হন না। ঠিক একই কারণে বয়ঃ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা কমে যায় বলে প্রবীণদের পক্ষে দলের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হয় না। এ কারণেই এ সংখ্যা মাত্র শতকরা ৬-এ নেমে গেছে।

৫.৬.৪ বিএনপি ও আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের বয়স সংক্রান্ত তুলনামুলক বিশ্লেষণঃ

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের বয়সের উপর গবেষণা করতে গিয়ে উভয় দলের ২০০ জন নেতাকে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করে জরিপের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগে তরুণ নেতার সংখ্যা ৯% এবং প্রান্তিক তরুণ নেতার সংখ্যা ২০%। মোট তরুণ নেতার শতকরা হার ৭ + ২০ = ২৭।

অপরদিকে, বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের মধ্যে তরুণ নেতার সংখ্যা ৮% এবং প্রান্তিক তরুণ নেতার সংখ্যা ২২%। মোট তরুণ নেতার শতকরা হার ৮ + ২২ = ৩০।

উপরোক্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগের তুলনায় বিএনপি'তে তরুণ নেতৃত্বের অংশগ্রহণ ও প্রভাব বেশী। এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, আওয়ামী লীগের চেয়ে বিএনপি'র প্রতি তরুণ নেতৃত্বের আগ্রহ বেশী।

আবার, আওয়ামী লীগের মধ্যবয়স্ক নেতাদের শতকরা হার ৪১। বিএনপি'র মধ্যবয়স্ক নেতাদের শতকরা হার ৪০। জরিপের ফলাফলে দেখা যায় যে, বিএনপি'র তুলনায় আওয়ামী লীগে মধ্যবয়স্ক নেতাদের সংখ্যাগত অবস্থান বেশী। এবং এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে বিএনপি'র তুলনায় আওয়ামী লীগের প্রতি মধ্য বয়স্ক নেতাদের আগ্রহ বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবীণ নেতাদের জরিপের ফলাফলে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগের প্রারম্ভিক প্রবীণ নেতাদের শতকরা হার ২৭ এবং প্রবীণ নেতাদের শতকরা হার ৫। তাহলে প্রবীণ নেতাদের মোট শতকরা হার দাঁড়ায় ৫ + ২৭ = ৩২।

একইভাবে, বিএনপি'র প্রবীণ নেতাদের মোট শতকরা হার দাঁড়ায় প্রারম্ভিক প্রবীণ নেতা ২৫% ও প্রবীণ নেতা ৬%। অর্থাৎ মোট ৩১%।

উপরোক্ত জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, বিএনপি'র তুলনায় আওয়ামী লীগে প্রবীণ নেতা সংখ্যাগতভাবে সামান্য বেশী। এথেকে স্পষ্ট যে, প্রবীণ নেতাদের অবস্থান বিএনপি ও আওয়ামী লীগে প্রায় সমান।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলের মধ্যে উদীয়মান নেতাদের বয়সভিত্তিক উপস্থিতির মধ্যে কিছুটা বৈসাদৃশ্য থাকলেও একটা বিষয়ে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। সেটা হলো উভয় দলেই মধ্যবয়স্ক নেতাদের উপস্থিতি লক্ষণীয় মাত্রায় বেশী। মধ্যবয়স্ক উদীয়মান নেতারা যেহেতু দুই দলেই সর্বোচ্চ সংখ্যক, সেহেতু ধরে নেয়া যেতে পারে উভয় দলের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এদের হাতে। এই মধ্য বয়স্ক নেতারা দলের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে যেমন প্রভাব বিস্তার করেন, তেমনি নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও এদের প্রাধান্য থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ ও উপসংহার

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি – এই দুটি প্রধান দলের উদীয়মান নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক পটভূমির উপর গবেষণায় বিগত অধ্যায়গুলোতে প্রমাণিত হয়েছে যে, সময়ের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে উদীয়মান নেতৃত্বের ভূমিকা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদীয়মান নেতৃত্বের আবির্ভাব, দলের ভিতর তাদের সংখ্যা ও প্রভাব বৃদ্ধির বিষয়টি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক আদলে রাষ্ট্রীয়করণ পলিসি গ্রহণের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগড়ার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু শাসক-শাসিতের মধ্যে সমন্বয়হীনতার জন্য সরকার ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে, যার পরিণতিতে '৭৫-এর ১৫-ই আগস্ট স্বপরিবারে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান নিহত হন। পরিসমাপ্তি ঘটে সমাজতান্ত্রিক মডেলে গণতন্ত্র বাস্তবায়নের স্বপ্ন। '৭৫-এর ১৫-ই আগস্টের পর বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তার বলয় পরিবর্তন করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনুকরণে বিরাষ্ট্রীয়করণ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে থাকে। এই ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পথ অনুসরণের সময় থেকে দেশের রাজনীতিতে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক-বেসামরিক আমলা ও উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণ শুরু হয় এবং এই ধারা নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর দেখা যায় উপরোক্ত দু'টি শ্রেণীর সাথে ছাত্র নেতারাও রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়। এসব ব্যক্তিরাই বর্তমানের উদীয়মান নেতা। রাজনীতিতে এদের বিকাশের ঐতিহাসিক পটভূমি অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে উদীয়মান নেতাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি এবং রাজনৈতিক দল দু'টিতে এদের প্রভাব বৃদ্ধির কারণ তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ব্যাপক ব্যাখা – বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উদীয়মান নেতাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি তাদের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং দল দু'টির উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করছে তা সংক্ষেপে ধারানুক্রমে তুলে ধরা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে বর্তমানে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় ঝোঁক প্রবল। অন্যান্য দলগুলো দু'টি প্রধান দলের সঙ্গে সমঝোতা করে রাজনীতিতে সহায়ক দল হিসাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। সংগত কারণে সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ, যারা নেতৃত্বদানে উৎসাহী, তারা আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র প্রতি অধিক আগ্রহ প্রদর্শন করেন। এর ফলে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'তে উদীয়মান নেতার সংখ্যা অন্যান্য দলের তুলনায় অনেক বেশী।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমিকে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দলভিত্তিক এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের অধিকাংশ এসেছেন (৮২%) শিক্ষার উচ্চ স্তর থেকে। যেহেতু বর্তমানে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ নেতৃত্বে বেশী আসছেন সেহেতু নিঃসন্দেহে বলা যায়, দল উচ্চ শিক্ষিতদের দ্বারা প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের (৮৬%) বেশীর ভাগই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উচ্চ শিক্ষিত নেতারা দলে গুরুত্ব বেশী পাচ্ছেন।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'তে স্ব-শিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত নেতাদের সংখ্যাগত অবস্থান ও গুরুত্ব কম। স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী নেতারা উভয় দলেই প্রভাবশালী। তবে অনুসন্ধানে দেখা গেছে, স্ব-শিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত নেতাদের আগ্রহ বিএনপি'র তুলনায় আওয়ামী লীগের প্রতি বেশী। অপরদিকে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের বিএনপি'র নেতৃত্বের প্রতি উৎসাহ বা ঝোঁক তুলনামূলকভাবে বেশী।

২. পেশা ঃ

পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ তার প্রারম্ভিক রাজনৈতিক আদর্শ থেকে সরে এসেছে। কারণ বর্তমান সময়ের উদীয়মান নেতাদের প্রায়

Dhaka University Institutional Repository

অর্ধেক এসেছেন ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে। প্রায় ১/৫ অংশ এসেছেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলাদের মধ্য থেকে। গবেষণা পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবসায়ী ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলা নেতারা বর্তমানে দলে ক্রমবর্ধিষ্ণু অবস্থায় আছেন।

বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের পেশার উপর গবেষণা পর্যবেক্ষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিএনপি'তে বর্তমানে ৪/৫ অংশ ব্যবসায়ী এবং ১/১০ অংশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলা রয়েছেন। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিএনপি'র শুরু হয়েছিল উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ী ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলাদের নিয়ে। সুতরাং বলা যায় যে, বিএনপি তার প্রারম্ভিক সময়ের আদর্শ থেকে সরে যায়নি, বরং আরো দৃঢ় হয়েছে।

উদীয়মান নেতাদের পেশাভিত্তিক তুলনামূলক বিশ্লেষণে এসে অবলোকন করা গেছে যে, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান পেশাজীবীরা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উভয় দলের মধ্যবিত্ত পেশাজীবীদের শতকরা হার যথাক্রমে আওয়ামী লীগে ২৮% ও বিএনপি'তে ১১%।

মধ্যবিত্ত পেশাজীবীদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর চাকুরীজীবীরা আছেন। তবে মধ্যবিত্ত পেশাজীবীদের হার দুই দলেই কম। কিন্তু আওয়ামী লীগে বিএনপি'র তুলনায় বেশী। যেহেতু ২৮% বা ১/৪ অংশের কিছু বেশী নেতা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছেন, সেহেতু বলা যায়, আওয়ামী লীগে এখনও মধ্যবিত্ত পেশাজীবীরা গুরুত্বপূর্ণ। আবার বিএনপি'র ১১% বা ১/১০ অংশের বেশী নেতা মধ্যবিত্ত পেশাজীবীদের মধ্য থেকে এসেছেন। সুতরাং মধ্যবিত্ত পেশাজীবীরা দলে একেবারে উপেক্ষিত নয়।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলে উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলারা রয়েছেন বেশী সংখ্যায়। নিঃসন্দেহে উভয় দলেই উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত নেতারা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছেন। কারণ আওয়ামী লীগে ১০০%-এর ভিতর ৭২% উচ্চবিত্ত নেতা এবং বিএনপি'তে ১০০%-এর

Dhaka University Institutional Repository

ভিতর ৭৯% উচ্চবিত্ত নেতা। সুতরাং তুলনামূলক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, আওয়ামী লীগের চেয়ে বিএনপি'র প্রতি উচ্চবিত্ত শ্রেণীর আগ্রহ বেশী।

৩. বাৎসরিক আয় ঃ

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের বার্ষিক আয়ের পরিমান ও উৎসের উপর গবেষণার ক্ষেত্রে জরিপভিত্তিক তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের বাৎসরিক আয়ের উপর জরিপে দেখা যায় যে, স্বল্প বা নিম্ন আয়ের নেতারা দলীয় নেতৃত্বে প্রায় বিলুপ্ত। কিন্তু উঠতি ধনিক শ্রেণী খুবই প্রভাবশালী। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছেন পুরনো ধনিক শ্রেণীর নেতারা। মধ্যম আয়ের নেতারা মাঝামাঝি অবস্থায় আছেন। আয়ের উৎসের উপর জরিপের ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একক উৎস থেকে উপার্জন করেন সীমিত সংখ্যক নেতা। আবার একাধিক উৎসের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কৃষি এবং বাড়ী ও দোকান ভাড়া। একাধিক উৎস হিসাবে কৃষি থেকে উপার্জনকারী এবং বাড়ী, এপার্টমেন্ট, দোকান ইত্যাদির ভাড়া অর্থাৎ নগর কেন্দ্রীক উৎস থেকে উপার্জনকারী নেতাদের দলের মধ্যে অবস্থান সমান।

বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের মধ্যে নিম্ন বা স্বল্প আয়ের নেতাদের অবস্থান আওয়ামী লীগের মতো সীমিত। এখানে ধনিক শ্রেণী খুবই প্রভাবশালী। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছেন উঠতি ধনিক শ্রেণীর নেতারা। মধ্যবিত্ত নেতাদের অবস্থান মোটামুটি স্থিতিশীল। বিএনপি'র ধনিক শ্রেণীর কিছু সংখ্যক নেতা একাধিক উৎস থেকে আয় করেন। একাধিক উৎসের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কৃষি এবং বাড়ী, এপার্টমেন্ট, দোকান ইত্যাদির ভাড়া। বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ৪৮% নেতা সরাসরি কৃষি থেকে উপার্জন করেন। এদের মধ্যে কারো একক উৎস, কারো একাধিক উৎস হিসাবে কৃষি রয়েছে।

তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের মধ্যে উঠতি ধনিক শ্রেণী সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী এবং বিএনপি'তে ধনিক শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠ। আওয়ামী লীগের ধনিক শ্রেণী দলের মধ্যে সংখ্যাগত অবস্থান ও প্রভাবের দিক থেকে দ্বিতীয়। কিন্তু বিএনপি'র উচ্চবিত্তরা (ধনিক শ্রেণী) যেমন দলের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী, তেমনি এদের বিত্তের পরিমান

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগের উচ্চবিত্তদের (ধনিক শ্রেণী) তুলনায় অনেক বেশী। আবার আয়ের উৎসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র ক্ষেত্রে উৎসগুলো একরকম থাকলেও উপার্জনকারী নেতাদের সংখ্যাগত তারতম্য রয়েছে। যেমন– কৃষি থেকে উপার্জনকারী এবং ভাড়া থেকে উপার্জনকারী আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের শতকরা হার সমান। বিএনপি'তে উভয় উৎস থেকে উপার্জনকারীদের মধ্যে সংখ্যাগত পার্থক্য রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে কৃষি থেকে উপার্জনকারীরা এগিয়ে রয়েছেন।

সুতরাং আয়ের পরিমান ও উৎসের উপর গবেষণা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায় যে, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলে ধনী ও উঠতি ধনিক শ্রেণীর অবস্থান দৃঢ় এবং দলের নীতি নির্ধারণেও তাদের প্রভাব বেশী।

৪. স্থায়ী বাসস্থান ঃ

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের স্থায়ী বাসস্থানের উপর জরিপভিত্তিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং উক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে এ বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের মধ্যে যে সব নেতাদের স্থায়ী নিবাস গ্রাম, তাদের অধিকাংশ অস্থায়ীভাবে শহরে বিশেষ করে রাজধানীতে বসবাস করেন। রাজধানীতে অস্থায়ী ভিত্তিতে বসবাসকারী নেতাদের মধ্যে অনেকে আবার নিয়মিতভাবে তার স্থায়ী নিবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। তবে নির্বাচনের জন্য দলীয় মনোনয়ন পেলে এসব নেতারা নিজ নির্বাচনী এলাকায় রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচনে জয়যুক্ত হতে পারলে নির্বাচনী এলাকার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তবে উদীয়মান নেতাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গ্রাম যাদের স্থায়ী ঠিকানা তারা যে পরিমান অস্থায়ী ভিত্তিতে শহরে বিশেষ করে রাজধানীতে বসবাস করেন, উপজেলা সদর যাদের স্থায়ী নিবাস তারা তুলনামূলকভাবে রাজধানীতে কম বসবাস করেন। জেলা সদরের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা আরো কম। একইভাবে, রাজধানী বাদে মেট্রোপলিটন এলাকা যাদের স্থায়ী নিবাস তারা কেউই অস্থায়ীভাবে অন্য কোথাও এমনকি রাজধানীতে বসবাস করেন না। আবার রাজধানী যাদের স্থায়ী

Dhaka University Institutional Repository

ঠিকানা তারাও অস্থায়ী ভিত্তিতে অন্য কোথাও বসবাস করেন না। গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাজধানীতে যে পরিমান নেতা স্থায়ীভাবে বসবাস করেন, তার কয়েকগুণ বেশী অস্থায়ীভাবে রাজধানীতে বসবাস করেন। আবার রাজধানী বাদে সমগ্র দেশে যে পরিমান নেতা বসবাস করেন, তার চেয়ে বেশী সংখ্যক নেতা রাজধানীতে (স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে) বসবাস করেন। এ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আওয়ামী লীগের বর্তমান রাজনীতি রাজধানী কেন্দ্রীক।

বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের মধ্যে যাদের স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম, তাদের বেশির ভাগ নেতাই দ্বিতীয় বাসস্থান হিসাবে শহরে বিশেষ করে রাজধানীতে বসবাস করেন। অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, জীবিকা নির্বাহ, উন্নত নাগরিক জীবন এবং কেন্দ্রীয় রাজনীতির সংস্পর্শে থাকাটাই এর প্রধান কারণ। তবে গ্রাম থেকে যারা শহরে আসেন তাদের মধ্যে বিকল্প বাসস্থান হিসাবে রাজধানীতে বসবাসের মাত্রা ততই কমে আসতে থাকে। যেমন– যাদের স্থায়ী নিবাস গ্রাম, তারা যত বেশী অস্থায়ীভাবে রাজধানীতে বসবাস করেন, তার চেয়ে উপজেলা সদরের স্থায়ীবাসি নেতারা আরো কম রাজধানীতে বসবাস করেন। জেলা সদরের স্থায়ীবাসি নেতাদের অস্থায়ী ভিত্তিতে রাজধানীতে বসবাসের পরিমান আরো কম এবং রাজধানী বাদে মেট্রোপলিটন এলাকার নেতারা কেউই রাজধানীতে বসবাস করেন না। রাজধানীর স্থায়ী নেতারা অস্থায়ীভাবে দেশের অন্য কোথাও বসবাস করেন না। বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের উপর গবেষণায় আরো দেখা যায় যে, সারা দেশে যে পরিমান নেতা শুধুমাত্র স্থায়ী বাসস্থানে বসবাস করেন, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী নেতা (স্থায়ী ও বহিরাগত মিলিয়ে) রাজধানীতে বসবাস করেন। সুতরাং এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, বিএনপি'র রাজনীতিতে রাজধানী কেন্দ্রীক প্রবণতা বেশী।

তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগের ৫৮% নেতা রাজধানীতে বসবাস করেন। এ থেকে বোঝা যায়, আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে নগর কেন্দ্রীক প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু বিএনপি'র ৭০% নেতা রাজধানীতে বসবাস করেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিএনপি'র রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের চেয়ে নগর কেন্দ্রীক প্রবণতা অনেক বেশী। তবে

Dhaka University Institutional Repository

উভয় দলে রাজধানী কেন্দ্রীক প্রবণতা যেমন আছে, আবার কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতির বিস্তার ঘটাতে তারা সক্ষম হয়েছেন। এখন প্রত্যন্ত অঞ্চল, দুর্গম পাহাড়েও ভোট গ্রহণ হয়। এসব এলকায় দুই দলের উদীয়মান নেতারাই রাজনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও নির্বাচনে ভোটের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে নিয়মিত যাতায়াত করেন।

বয়স ঃ

উদীয়মান নেতাদের বয়সের উপর গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে যে, আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতাদের মধ্যে সংখ্যাগতভাবে বয়সে তরুণ কম আছেন। তবে মধ্যবয়স্ক নেতারা দলের ভিতর সংখ্যাগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছেন। গবেষণায় আরো দেখা যায় যে, মধ্যবয়স্ক নেতারা দলের নীতি নির্ধারণীতে তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা রাখেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ এসব নেতারাই বেশী লাভ করেন। প্রবীণ নেতাদের উপস্থিতি দলে নিতান্ত কম নয়। দল এদের যথাযথ সম্মানও প্রদর্শন করে। তবে মধ্যবয়স্ক নেতারাই দলে অধিক প্রভাবশালী।

বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের মধ্যে তরুণ নেতারা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছেন। তবে মধ্যবয়স্ক নেতারা দলের ভিতর বেশী প্রভাবশালী। ফলে দলীয় সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে নির্বাচনের জন্য দলীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে মধ্যবয়স্ক নেতারা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। প্রবীণ নেতারা দলে সম্মানজনক অবস্থায় আছেন এবং তাদেরকে দল যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তবে মাঠ পর্যায়ে দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তরুণ ও মধ্যবয়স্ক নেতারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

তুলনামূলক বিশ্লেষণে আওয়ামী লীগের চেয়ে বিএনপি'তে তরুণ নেতারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অনুসন্ধানে আরো দেখা যায় যে, তরুণরা আওয়ামী লীগের চেয়ে বিএনপি'র প্রতি আগ্রহী বেশী। মধ্য বয়স্কদের উভয় দলের প্রতি প্রায় সমান মনোযোগ লক্ষ্য করা গেছে। পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় যে, মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিবর্গের গুরুত্বপূর্ণ দলীয় পদের প্রতি আর্কষণ বেশী থাকে। এ কারণে অধিকাংশ মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি দলের নেতৃত্ব নিশ্চিত করে থাকেন। পুরনো

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্যবাহী দল হিসাবে আওয়ামী লীগের প্রতি প্রবীণদের আগ্রহটা তুলনামূলকভাবে বেশী। তবে সার্বিক দিক বিবেচনায় দেখা যায় যে, উভয় দলেই মধ্যবয়স্ক নেতাদের গুরুত্ব বেশী।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমির উপর গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আওয়ামী লীগে স্বশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত নেতারা বিএনপি'র তুলনায় বেশী। উচ্চশিক্ষিত নেতা উভয় দলে প্রভাবশালী হলেও তুলনামূলকভাবে বিএনপি'তে এ সংখ্যা অধিক। আবার, মধ্যবিত্ত পেশাজীবী শ্রেণীর আগ্রহ আওয়ামী লীগের প্রতি অধিক মাত্রায় লক্ষণীয়। অনুরূপভাবে বিএনপি'র প্রতি উচ্চবিত্ত শ্রেণীর উৎসাহ প্রত্যক্ষ করা যায়।

নিম্ন আয়ের নেতারা উভয় দলেই সংখ্যালঘু। তবে উঠতি ধনিক শ্রেণী ও ধনিক শ্রেণী দুই দলে প্রভাবশালী হলেও আওয়ামী লীগে উঠতি ধনিক শ্রেণীর প্রভাব বেশী। অপরপক্ষে, বিএনপি'তে ধনিক শ্রেণী অধিক মাত্রায় প্রভাবশালী। বিএনপি'র ধনিক শ্রেণী তুলনামূলকভাবে আওয়ামী লীগের ধনিক শ্রেণী থেকে অনেক বেশী ধনী।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলের মধ্যে নগর কেন্দ্রীক রাজনীতির চর্চা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তবে আওয়ামী লীগের তুলনায় বিএনপি'তে নগর কেন্দ্রীক রাজনীতির প্রবণতা বেশী। আওয়ামী লীগের তুলনায় বিএনপি'তে উদীয়মান তরুণ নেতৃত্বের উপস্থিতি বেশী। মধ্যবয়স্ক নেতারা উভয় দলেই প্রভাবশালী। প্রবীণ নেতৃত্বের সংখ্যা বিএনপি'র চেয়ে আওয়ামী লীগে বেশী।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক পটভূমির উপর গবেষণায় যেমন বৈসাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি উভয় দলের নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে সাদৃশ্যও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন-উভয় দলের অধিকাংশ নেতা উচ্চশিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, অত্যন্ত স্বচ্ছল। গবেষণায় আরো দেখা যায় যে, উভয় দলে উদীয়মান নেতাদের একটা বড় অংশ রাজধানীতে বসবাস করেন। রাজধানীতে বসবাসের কারণে এসব নেতারা কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় রাজনীতিকে প্রাণবন্ত রাখেন। বয়সের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উভয় দলে উদীয়মান নেতাদের মধ্যে ২৫ বছরের নীচে কোন তরুণ নেতা খুঁজে পাওয়া যায়নি; আবার ৭০ বছরের উপরের কোন প্রবীণ নেতার সন্ধান মেলেনি।

সবশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশেষ করে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র নেতৃত্বে উদীয়মান নেতাদের প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদীয়মান নেতাদের অধিকাংশই মধ্যবয়সী ও শহর কেন্দ্রীক; পেশাগত দিক দিয়ে ব্যবসায়ী ও অবসরপ্রাপ্ত সামরিক-বেসামরিক আমলা। শ্রেণীগতভাবে এরা ধনিক ও উঠতি ধনিক শ্রেণীর অন্তর্গত।

পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট যে, সূচনা লগ্নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ পেশাজীবীদের যে প্রাধান্য ছিল, সময়ের বিবর্তনে তার পরিবর্তন ঘটেছে। সাম্প্রতিককালে আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতৃত্বে ব্যবসায়ী ও আমলাদের প্রাধান্য ও প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠা লগ্নে বিএনপি'র নেতৃত্বে ব্যবসায়ী ও আমলাদের যে প্রাধান্য ও প্রভাব ছিল তা বর্তমান উদীয়মান নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান আছে। এ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র উদীয়মান নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বর্তমানে মৌলিক শ্রেণীগত পার্থক্য নেই। উভয় দলের নেতৃত্ব একই শ্রেণী হতে আগত; শুধু কিছুটা পরিমাণগত পার্থক্য রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

গ্রন্থপঞ্জী (বাংলা)

১. আসাদ, আবুল, *একশ বছরের রাজনীতি*, বি,সি,বি,এস, ঢাকা-২০০৫ ।

২. আহমদ, সা'দ, *আমার দেখা সমাজ ও রাজনীতির তিনকাল*, খোশরাজ কিতাব মহল, ঢাকা-২০০৬ ।

৩. আহমদ, আবুল মনসুর, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৭৫ ।

৪. আহমেদ, মওদুদ, *বাংলাদেশ ঃ শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা-১৯৮২ ।

৫. আহমদ, সরকার সাহাবুদ্দিন, *আত্মঘাতি রাজনীতির তিনকাল*, বুকস ফেয়ার, ঢাকা-২০০৪ ।

৬. কাদের, আহমেদ আব্দুল, *বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও ধর্ম নিরপেক্ষতা, ইসলামী রাজনীতি*, বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিঃ, ঢাকা-২০০৮ ।

৭. কায়সার, আশরাফ, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকান্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৫ ।

৮. খান, আবেদ, *বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি ঃ ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কট* (সৈয়দ আমিরুল ইসলাম ও কাজল বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত) জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, ঢাকা-১৯৯৯ ।

৯. দলিলপত্র, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের (তৃতীয় খন্ড), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১৯৮২ ।

১০. নাথ, বিপুল রঞ্জন, *বাংলাদেশের সাংবিধানিক রাজনৈতিক দলিল*, বুক সোসাইটি, ঢাকা-১৯৮২ ।

১১. নুর, আবদুন, *জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ*, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০ ।

১২. ভূইয়া, ওয়াদুদ, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা-২০০৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. রনো, হায়দার আকবর খান, *বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক* (প্রথম খন্ড), তারেক শামসুর রহমান সম্পাদিত, শোভা প্রকাশ, ঢাকা-২০০৯।

১৪. রফিক, আহমদ, *বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তির ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কট* (সৈয়দ আমিরুল ইসলাম ও কাজল বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত) জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, ঢাকা-১৯৯৯।

১৫. রশীদ, হারুনুর, *রাজনীতি কোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৯।

১৬. রেহমান, ড. তারেক শামসুর, *জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ*, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০।

১৭. রেহমান, ড. তারেক শামসুর, *বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক* (প্রথম খন্ড) শোভা প্রকাশ, ঢাকা-২০০৯।

১৮. রেহমান, ড. তারেক শামসুর, *জিয়াউর রহমানের বৈদেশিক নীতি*, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০।

১৯. মজিদ, শিরিন, *শেখ মুজিব থেকে খালেদা জিয়া*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৮।

২০. শাকিল, এম জহিরুল হক, *বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক* (প্রথম খন্ড) শোভা প্রকাশ, ঢাকা-২০০৯।

২১. শাহা, পরশ, *বাংলাদেশের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি* (এরশাদ পর্ব) জোৎস্না পাবলিকেশন্স লিঃ, ঢাকা-১৯৯৭।

২২. সাইদ, আবু আল, *মুসলিম শাসনকাল, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও বঙ্গবন্ধু* (১২০৬-১৯৭৫) আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৭।

২৩. সেন, অনুপম, *বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সমাজ*, অবসর প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৯।

২৪. সোবহান, রেহমান, *বাংলাদেশ আত্মনির্ভর উন্নয়নের পথ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯০।

২৫. হক, আবুল ফজল, *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, টাউন স্টোর্স, রংপুর-১৯৯২।

২৬. হান্নান, ড. মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ১৯৯০-১৯৯৯*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-২০০০।

২৭. হাসান, মোহাম্মদ, *বাংলাদেশ ঃ ধর্ম সমাজ ও রাজনীতি*, গ্রন্থমেলা, ঢাকা-২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

২৮. হাসানুজ্জামান, আল মাসুদ, ***রোল অব অপোজিশন ইন বাংলাদেশ পলিটিক্স***, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা-১৯৯৮।

২৯. হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার, ***বাংলাদেশ ঃ রাজনীতির ২৫ বছর*** (তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৮।

৩০. হায়দার, আবুল কাশেম ও মাহমুদ, সোহেল, ***বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাস, নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ থেকে খালেদা জিয়া***, প্যানরোমা পাবলিকেশন্স লিঃ, ঢাকা-১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী (ইংরেজী)

1. Ahamed, Moudud, ***Era of Sheikh Mujibur Rahman***, UPL, Dhaka-1983.

2. Ahamed, Nizam, ***The Parliament of Bangladesh***, Alsgate, U.K. 2002.

3. Ball, Allan R., ***Modern Politics and Government***, London, The MacMillan Press Ltd., 1977.

4. Black James A. and Champion, Denny, ***Methods and Issues in Social Research***, New York, John Hill and Sons Ltd., 1975.

5. Brand M. Boss, ***Transformational Leadership***, Lawrence Erbaven Publishers, New Jersey, 1998.

6. Cartwright, John, ***Political Leadership in America***, Croomhelms, London, 1983.

7. Chowdhury, Dilara, ***Bangladesh and the South Asian International System***, Scorpion Publication Limited, London, 1992.

8. Denzin, Normank, ***The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods***, New York: Mc Grow-Hill Book Co., 1978.

9. ***Encyclopedia Britanika***, Vol. 16, 2005.

10. Holt, Robert T. and Turner John E, ***The Methodology of Comparative Research***, New York, Free Press, 1983.

11. Huntington, Samuel P., ***The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century***, University of Oklahoma Press, 1991.

12. Jahan, Rownaq, ***Pakistan : Failure in National Integration***, University Press, 2005.

13. Jay A. Conger, ***The Charismatic Leader***, Jossey – Boss Publishers, San Francisco, 1989.

14. Kapur, K. D., ***Soviet Strategy in South Asia***, New Delhi, 1983.

15. Kellermen, Barbara, ***Political Leadership***, University of Pittersburg Press, 1986.

16. Kellermen, Barbara, ***Reventing Leadership: Politics and Business***, State University Press, 1986.

Dhaka University Institutional Repository

17. Martin M. Cheraens and Roya Ayman, ***Leadership Theory and Research***, Academic Press, Sandieago California, 1993.

18. Moniruzzaman. Talukder, ***The Bangladesh Revolution and its Aftermath***. University Press, Dhaka- 2005.

19. Piyors, ***Leadership on Domination***, Miffin, 1935.

20. Rahman, Ataur, ***Challenges of Governance in Bangladesh***, BIISS Journal, Iseas and Dhaka, 2003.

21. Robert, K. Greenleaf, ***The Power of Servent Leadership***. Burret Cochlee Publishers, 1998.

22. Ronald, Heifetz, ***Leadership without easy Answer***, Harvard University Press, 1996.

23. Rose, Arnold M., ***Sociology: The Study of Human Relations***, New York: Alfred P. Mopt, 1975.